দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল ১৯৯১
চৈত্র ১৩৯৭

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক প্রশাসন সাময়িকী

দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, চৈত্র ১৩৯৭

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

© ১৩৯৭
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা

বিপিএটিসি ঃ প্রকা–৩০/বাজা–৪/৯০
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার ঃ ৩৫১.০০০৫

প্রচ্ছদ ঃ কাজী আজাদ

বিনিময় মুল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

LOK PROSHASHON SAMOYEKY
Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka.

Volume 2, April 1991, Chaitra 1397.

Editor : **Mohammad Jahangir Hossain**

Associate Editor : **M. Emamul Haque**

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক প্রশাসন সাময়িকী

সম্পাদনা–পরিষদ ঃ

মুহম্মদ আব্দুস সালাম

আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া

ডঃ মোহাম্মদ তারেক

সৈয়দ নকীব মুসলীম

কংকা জামিল খান

সম্পাদক ঃ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

সহযোগী সম্পাদক ঃ

মোঃ ইমামুল হক

দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯১ চৈত্র ১৩৯৭

লেখকের জ্ঞাতব্য

* লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক লেখা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়।

* পান্ডুলিপির ২ প্রস্থ সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা– এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

* লেখা ১১·৫ x ৮·৫ সাইজের কাগজে একপৃষ্ঠায় এবং অনধিক ৩০ পৃষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয় (সংযোজনী ও গ্রন্থ পঞ্জী ছাড়া)।

* প্রাসঙ্গিক সূত্রসমুহ প্রবন্ধের শেষে পাদটীকা ও প্রয়োজনে গ্রন্থপুঞ্জী হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

* লেখা অপ্রকাশিত হতে হবে।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
২য় সংখ্যা
এপ্রিল ১৯৯১, চৈত্র ১৩৯৭

সূচীপত্র

সাধারণী–বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ
একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৫
কংকা জামিল খান

বাংলাদেশের গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহ ২১
জোবায়ের এনামুল করিম

নারী জাগরণ ও বাংলাদেশের প্রশাসনে নারীদের ভূমিকা ৪৩
আয়েশা আজিম

উন্নয়নের সূচক ৫৩
নাসির উদ্দিন আহমেদ

জাতীয় উন্নয়নে লোকজ মাধ্যমের ব্যবহার ঃ
বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৬৩
ডঃ মোহাম্মদ হাননান

জনসংযোগের স্বরূপঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ৮১
মোঃ ইমামুল হক

নথি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ৮৯
সৈয়দ শামসুল আলম

ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন ৯৯
কাজী হাসান ইমাম

পুস্তক সমালোচনা ১২১

লেখক পরিচিতি

কংকা জামিল খান
সহকারী পরিচালক, ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জোবায়ের এনামুল করিম
গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আয়েশা আজিম
উপ-পরিচালক, আচরণ বিজ্ঞান, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নাসির উদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডঃ মোহাম্মদ হাননান
তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়; বর্তমানে সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত।

ইমামুল হক
প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সৈয়দ শামসুল আলম
উপ-পরিচালক, কর্মী ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কাজী হাসান ইমাম
মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাধারণী– বিশেষজ্ঞ দ্বন্দের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

কঙ্কা[illegible] জামিল খান

১.০. বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিমন্ডলে সাধারণী–বিশেষজ্ঞ (generalist-specialist) দ্বন্দ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস এবং ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা ব্যতীত খুব কম দেশেই সাধারণী–বিশেষজ্ঞের অবিমিশ্র পৃথকীকরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে অনুরুপ সমস্যা অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও কম বেশী দেখা যায়।

১.১. প্রবন্ধের শুরুতেই সাধারণী ও বিশেষজ্ঞ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ বলতে বিশেষ কোন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্ত/অথবা পেশাদারী গুণ সম্পন্ন সে সব ব্যক্তিদের বুঝায় যারা তাদের বিশেষ দক্ষতার সাথে সংগতিপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ পর্যায়ে স্থপতি, আইনবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক, হিসাব রক্ষক, অর্থনীতিবিদ, নকশাবিদ, যন্ত্রবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে কোন কোন বিশেষজ্ঞ যেমন ডাক্তার, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ যেমন নকশাবিদ, যন্ত্রবিদ কর্মজীবনে প্রবেশের পর দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।[১] সাধারণী শব্দটি মূলতঃ ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। সাধারণী বলতে তাদের বোঝায় যারা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন এবং তাদের নিয়োগের সময় বিশেষ কোন বিষয় নয় –শ্রেষ্ঠত্বকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। যে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধারণী কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা হয় যাতে প্রশাসনের যে কোন শাখায় তারা আদর্শ ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতে পারেন।[২]

১.২. যদিও সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ উভয়ই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা বলে লোক প্রশাসনের বিভিন্ন অংগনে অবদান রাখেন তথাপি ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তারা ভিন্নতর মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। যুক্তরাজ্যে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের পূর্বে রাজনৈতিক পুনর্গঠন সাধিত হয় এবং সংসদীয় নেতৃবৃন্দ তাদের সচিব ও সহকারীদের মধ্যে নিজেদের ধ্যান ধারণার প্রতিফলন দেখতে চান। কাজেই তারা বিশেষজ্ঞদের চাইতে ব্যাপক দৃষ্টিভংগি ও সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর অধিক নির্ভর করতেন। অন্যদিকে ফ্রান্সের রাজা তার নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য আইনবিদ, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সমন্বয়ে প্রশাসনিক যন্ত্র গঠন করেন এবং রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর না করে রাজনৈতিক বন্ধুদের উপর নির্ভর করতেন। তুলনামূলক ভাবে নতুন দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রশ্নের চাইতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কাজেই প্রথম থেকেই সে সব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ব্যবহারে দক্ষ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখতে সক্ষম বিশেষজ্ঞদের অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে।[৩]

১.৩. সাধারণী- বিশেষজ্ঞ দ্বন্দের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য প্রবন্ধটিকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে বাংলাদেশ, দ্বিতীয় অংশে যুক্তরাজ্য, তৃতীয় অংশে যুক্তরাষ্ট্র, ও চতুর্থ অংশে ফ্রান্স এর সিভিল সার্ভিসের আলোকে সাধারণী-বিশেষজ্ঞ সমস্যাটি আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অংশে উপরোক্ত চারটি দেশে আলোচ্য সমস্যাটি দূর করার বিভিন্ন প্রয়াসের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে সাধারণী-বিশেষজ্ঞ দীর্ঘকালীন দ্বন্দ ঃ

২.০. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ব্রিটিশ-ভারত সিভিল সার্ভিসের অনুকরণে গঠিত। যথাক্রমে নর্থকোট টেভেলিয়ন রিপোর্ট ১৮৫৩ (North Cote Trevelyan Report) ও ম্যাকলে রিপোর্ট ১৮৫৪ (Maculay Report) এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও ব্রিটিশ-ভারত সিভিল সার্ভিস সাধারণী ধারণার গোড়াপত্তন হয় ও প্রাধান্য লাভ করে। উভয় রিপোর্টে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদানীন্তন প্রশাসন ব্যবস্থার অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য ত্রুটি সমূহের সমালোচনা করা হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়।[৪] রিপোর্ট দু'টি প্রশাসনের শীর্ষভাগের উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং উভয়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো

স্নাতকধারী ব্রিটিশ নাগরিকগণ। রিপোর্টে প্রশাসকদের অধীনে কর্মরত বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সহকারীদের প্রতি আলোকপাত করা হয়নি।[৫]

২.১. ম্যাকলে রিপোর্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি দ্বারা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ ও সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্তদের প্রতি সংস্কারকদের পক্ষপাতিত্ব প্রতীয়মান হয়। যেমন–রিপোর্টে বলা হয়েছে, –"the duties of a civil servant of the East India Company are so high a nature that in his case it is peculiarly desirable that an excellent general education, such as may enlarge and strengthen his understanding should precede the special education which must qualify him to despatch the business of his cutcherry.[৬] It is therefore desirable that a civil servant received the best, the liberal, the most finished education that his native country affords.[৭]

–উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ কলায় সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্ররা সর্বাধিক কাম্য ছিলো। সে কারণে রিপোর্টে যুক্তরাজ্যের শ্রেষ্ঠ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের মেধার প্রশংসা করা হয়েছে ও তাদের নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও পক্ষপাতিত্বদেখানোহয়েছে।[৮]

২.২. ব্রিটিশ ভারত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ছিল ২৩ বছর এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, অংক, সাধারণ ও নৈতিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা মিলিয়ে আরও পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষানবীস কর্মকর্তা হিসাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হেইলীবারী কলেজে (Haileybury College) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হতো। দুবছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কালে– ১) ভারতীয় ইতিহাস, ২) আইন, ৩) বাণিজ্য ও অর্থনীতি, এবং ৪) ভারতীয় ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। উপরোক্ত চারটি বিষয়ের পরীক্ষায় কৃর্তকার্য শিক্ষানবীস কর্মকর্তাদের কোম্পানীর সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হতো। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হতো। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এ সকল কর্মকর্তার বয়স মধ্য চল্লিসের কোঠায় পৌছুলে তারা যুক্তরাজ্যে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ ভারত সিভিল সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী পদেআসীনহতেন।

২.৩. পরবর্তীতে সার্ভিসে নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু শীর্ষ স্থানীয় নীতি নির্ধারণী পদসমূহে সাধারণী প্রশাসকদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থেকেছে।

২.৪. ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ম্যাকলে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয় ছিল যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ে যথাক্রমে সি, এস, পি, এবং ই, পি, সি, এস, ক্যাডারের সাধারণী কর্মকর্তাগণ প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলেন। [৯] অনুরূপভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত সচিবালয় এবং সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদ সমুহ পুরণে এখনও ব্রিটিশ–ভারত পদ্ধতি কম বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৫. ব্রিটিশ আমল থেকে সচিবালয়ের পদ সমুহ ক্ষণকালীন পদ (tenure post) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদ সমূহ পুরণের জন্য মাঠ প্রশাসনে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতির যৌক্তিতা হিসেবে মনে করা হয় যেহেতু এ সকল কর্মকর্তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন সেহেতু স্থানীয় প্রশাসনিক পরিমন্ডল ও জনসাধারণের সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা একটি ধারণা অর্জন করেন। কাজেই জনগণের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীদের সচিব হিসেবে তারা অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন দ্বিতীয়ত, পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসকগণ নীতি নির্ধারণে অধিক হারে ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। তাছাড়া কোন কর্মকর্তা সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত হলে তিনি তাঁর উপযুক্ত কোন পদে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পান। [১০]

২.৬. একদিকে মন্ত্রণালয় সমূহ নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করে অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট বিভিন্ন সংযুক্ত দপ্তর (attached bodies) নীতি বাস্তবায়ন করে। সাধারণত এ সকল দপ্তরে বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন এবং তারা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়কে প্রায়োগিক ও বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ দান করেন।

২.৭. পাকিস্তান আমলে সচিবালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো। প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞগণ নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং নীতি নির্ধারণে তাদের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ সংযুক্ত দপ্তরের প্রধানগণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী প্রধান অর্থাৎ সচিবদের অপেক্ষা নিম্নতর প্রশাসনিক পদমর্যদা ভোগ করতেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সচিবদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিলো। তৃতীয়তঃ আর্থিক দিক থেকে, সচিবালয়ের সাধারণী কর্মকর্তাগণ বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতন ক্রম ভোগ করতেন। [১১]

২.৪. ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ম্যাকলে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয় ছিল যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ে যথাক্রমে সি, এস, পি, এবং ই, পি, সি, এস, ক্যাডারের সাধারণী কর্মকর্তাগণ প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলেন। [৯] অনুরূপভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত সচিবালয় এবং সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদ সমূহ পুরণে এখনও ব্রিটিশ–ভারত পদ্ধতি কম বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৫. ব্রিটিশ আমল থেকে সচিবালয়ের পদ সমূহ ক্ষণকালীন পদ (tenure post) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদ সমূহ পুরণের জন্য মাঠ প্রশাসনে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতির যৌক্তিতা হিসেবে মনে করা হয় যেহেতু এ সকল কর্মকর্তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন সেহেতু স্থানীয় প্রশাসনিক পরিমন্ডল ও জনসাধারণের সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা একটি ধারণা অর্জন করেন। কাজেই জনগণের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীদের সচিব হিসেবে তারা অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন দ্বিতীয়ত, পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসকগণ নীতি নির্ধারণে অধিক হারে ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। তাছাড়া কোন কর্মকর্তা সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত হলে তিনি তাঁর উপযুক্ত কোন পদে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পান। [১০]

২.৬. একদিকে মন্ত্রণালয় সমূহ নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করে অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট বিভিন্ন সংযুক্ত দপ্তর (attached bodies) নীতি বাস্তবায়ন করে। সাধারণত এ সকল দপ্তরে বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন এবং তারা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়কে প্রায়োগিক ও বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ দান করেন।

২.৭. পাকিস্তান আমলে সচিবালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো। প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞগণ নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং নীতি নির্ধারণে তাদের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ সংযুক্ত দপ্তরের প্রধানগণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী প্রধান অর্থাৎ সচিবদের অপেক্ষা নিম্নতর প্রশাসনিক পদমর্যদা ভোগ করতেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সচিবদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিলো। তৃতীয়তঃ আর্থিক দিক থেকে, সচিবালয়ের সাধারণী কর্মকর্তাগণ বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতন ক্রম ভোগ করতেন। [১১]

২.৮. বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে সমরূপ বেতনক্রম কাঠামো (uniform pay grade structure) ও ১৯৮০ সালে একীভূত সিভিল সার্ভিস কাঠামো (Unified civil service structure) প্রবর্তনের মাধ্যমে সাধারণী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিদ্যমান আর্থিক অসমতা দূর হয়েছে।

২.৯. মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী প্রধান পদে বিশেষজ্ঞদের প্রবেশ না থাকায় পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি তাঁরা এ পদ্ধতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করে আসছেন। তারা মনে করেন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালনে তাদের সুযোগ দেয়া উচিৎ। কারণ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন কারিগরী ও সেবা মূলক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে যে ধরনের কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে মন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করার দক্ষতা সাধারণী কর্মকর্তাদের থাকার কথা নয়। অন্যদিকে, সাধারণীরা বিশেষজ্ঞদের নীতি নির্ধারণী পদের জন্য অনুপযুক্ত মনে করেন। তাঁদের মতে বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে সম্যকভাবে ধারণা প্রাপ্ত হওয়ায় পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সচেতন ও মনোযোগী হন এবং এ ধরনের পেশাগত সংকীর্ণতা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনা।[১২] সাধারণী ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের বক্তব্যে যৌক্তিকতা রয়েছে। এ কথা সত্য কোন কোন কারিগরী মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বিশেষজ্ঞরা অধিক উপযুক্ত হবেন। অন্যদিকে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপক ও নীতি নির্ধারক হিসেবে ব্যর্থও হতে পারেন।

২.১০. একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সুযোগ প্রদানের জন্য ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে 'সিনিয়র পলিসি পুল' গঠন করা হয়। এ পুল সকল ক্যাডার সার্ভিসের শীর্ষে একটি ক্যাডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণী ও বিশেষজ্ঞ উভয়ই এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সচিবালয়ের সকল উপ–সচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের পদ পুলের সদস্যদের দ্বারা পূরণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

২.১১. ১৯৭৯ সালের সিনিয়র পলিসি পুল অধ্যাদেশ অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য নিম্নে বর্ণিত ৪৫ অনুর্ধ কর্মকর্তাগণ যোগ্য বিবেচিত হন।[১৩]

অ) স্বাধীনতা পূর্ব নিয়মিত সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে সরাসরিভাবে নিযুক্ত ও বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদুর্ধ বেতন ক্রমে অবস্থিত সে সকল কর্মকর্তা–যাদের চাকুরীর মেয়াদ ১০ বছরের উর্ধ্বে ও ১৫ বছরের নিম্নে রয়েছে; (আ) জাতীয় বেতন ক্রমের ১৬৫০–৩০২০ স্কেলে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা যাদের চাকুরীর মেয়াদ ১০ বছরের উর্ধ্বে ও ১৫ বছরের নিম্নে রয়েছে এবং যারা বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদুর্ধ স্কেলে

অবস্থান করছেন; (ই) সে সকল কর্মকর্তা যারা (১) পদন্নোতির মাধ্যমে বর্তমান বেতনক্রমের ১৬৫০-৩০২০ স্কেল অর্জন করেছেন, (২) উক্ত পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে ৫ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করছেন, (৩) বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদূর্ধ স্কেলে অবস্থান করছেন, ও (৪) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে অন্তত ১০ বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে।।

২.১২. পুলের সদস্য হওয়ার পর একজন কর্মকর্তা সচিবালয়ের উপ-সচিব পদে কাজ শুরু করবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও এককালীন নিয়োগের মাধ্যমে যে সকল কর্মকর্তা কোন এক সময় সচিবালয়ের উপ-সবিচ বা তদূর্ধ পদে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক অথবা পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া সরকার ভূতপূর্ব নিয়মিত সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সদস্যদেরও পুলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

২.১৩ সিনিয়র পলিসি পুলের মাধ্যমে পুলের ৫০ শতাংশ সদস্য নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারবে বলে আশা করা হয়। অর্থাৎ এ ৫০ শতাংশ সদস্য সচিবালয় পর্যায়ে তাদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে এবং বাকী ৫০ শতাংশ সদস্য সাধারণী কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

২.১৪. ১৯৮৯ সালে সিনিয়র পলিসি পুল বিলোপ করা হয়। পুল বিলুপ্ত হওয়ায় নীতি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের সরাসরি ভূমিকা রাখার দাবী এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়েছে।

খ) ফুলটন প্রতিবেদনঃ ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের বিশেষায়নঃ

৩.০. ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের কাঠামোগত ত্রুটি ও অনিয়ম সমূহ চিহ্নিত ও সংশোধন করার জন্য ১৯৬৬ সালে ফুলটন কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটি প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জটিল কর্ম ও দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস উনবিংশ শতাব্দীর নর্থকোর্ট টেভেলিয়ন রিপোর্টের দর্শন ও কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখেছে।[১৪] ফুলটন রিপোর্টে আরও বলা হয়, বর্তমান যুগে রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক,সামাজিক, অর্থনৈতিক, কারিগরী বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই সরকারী চাকুরীজীবিদের নিজস্ব ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে ও নতুন কিছু সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায় বর্তমান যুগে সিভিল সার্ভিসে সর্ব-বিষয়জ্ঞ বলে কোন কথা থাকা উচিৎ নয়। বরং প্রকৃত পেশাদার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সিভিল সার্ভিস গঠিত হবে।[১৫]

৩.১. প্রতিবেদনে (অনুচ্ছেদ ৩৫ ও ৩৯) দুই ধরনের পেশাদারির কথা বলা হয়েছে। **প্রথমতঃ** বিশেষজ্ঞদের পেশাদারীর কথা বলা হয়েছে যারা নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। **দ্বিতীয়তঃ** প্রশাসকদের পেশাদারীর কথা বলা হয়েছে এবং কমিটির মতে এ ধরনের পেশাদারী আনয়ন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

৩.২. প্রতিবেদনে (অনুঃ ৭৪ ও ৭৫) বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্রেষ্ঠ স্নাতকদের সর্ব বিষয়জ্ঞ সাধারণী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ না করার পক্ষে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করার জন্য কমিটি প্রশাসনকে আর্থ ও সামাজিক দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে এবং এ দুই ক্ষেত্রে নিয়োগের সময় প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রবণতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্ররা উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রের কোনটির দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার মত দক্ষ হবে না–তথাপি কমিটি মনে করে তাদের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখা পড়া ও চাকুরীপূর্ব অন্যান্য যোগ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৩.৩. প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের ব্যাপারে মৌলিক কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। যেহেতু তারা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন সেহেতু তাদের নিয়োগের সময় প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা আবশ্যিকভাবে যাচাই করা হয়। প্রতিবেদনে (অনুঃ ৭২ ও ৭৩) নিয়োগকারী দপ্তর/সংস্থা দ্বারা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করার প্রচলিত নিয়মকে সমর্থন করা হয়েছে। তবে উচ্চ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদে বিশেজ্ঞদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেদনে তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.৪. কমিটি মনে করে সকল কর্মকর্তার চাকুরী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করা উচিৎ। যারা নিজস্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জনে আগ্রহী তারা স্বাভাবিক ভাবে নিজস্ব গন্ডির বাইরে যাবেন না। অন্যদিকে, যারা প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণে আগ্রহী তারা নির্দিষ্ট সময়ের পর উচ্চতর প্রশাসনিক সার্ভিসে প্রবেশ করবেন। সে কারণে প্রতিবেদনে (অনুঃ ২২৪) উচ্চতর প্রশাসনিক সার্ভিস সকল পেশাজীবির জন্য উম্মুক্ত করার সুপারিশ রাখা হয়েছে।

৩.৫. প্রতিবেদনে (অনুঃ ১৪৯) মন্ত্রণালয়ের সার্বিক প্রশাসনিক ক্ষমতা সচিবের হাতে থাকা উচিৎ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কারিগরী মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার পক্ষে সুপারিশ রাখা হয়েছে। তাছাড়া কমিটি মন্ত্রীর জন্য এক বা একাধিক নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ও প্রয়োজন অনুসারে কারিগরী বিষয়ক উপদেষ্টা পদ সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির ডিরেক্টর ড্যু ক্যাবিনেট (Director du

Cabinet)এর মত নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা মন্ত্রীকে প্রাত্যহিক ও জটিল নীতি বিষয়ক কাজকর্মে সহযোগিতা প্রদান করবেন। নীতি ও কারিগরী বিষয়ক উপদেষ্টাদের মন্ত্রীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও প্রাত্যহিক যোগাযোগ থাকবে।

৩.৬. ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস থেকে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী পদ্ধতি অপসারণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ একটি শ্রেণীমুক্ত ও পেশা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিস সৃষ্টি করার পক্ষে সুপারিশ রাখা হয় (অনুঃ ২১৫ ও ২১৮)। সে উদ্দেশ্যে কমিটি সার্ভিসের সকল পদের জন্য (উৎপাদন খাত ব্যতীত) একটি সমরূপ বেতনক্রম কাঠামো (uniform pay grade structure) সুপারিশ করে। উক্ত বেতনক্রম কাঠামোতে ২০টি গ্রেড বা ক্রম সুপারিশ করা হয়।

৩.৭. ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে ফুলটন প্রতিবেদনের গুরুত্ব ও প্রভাব অনুধাবনের জন্য সার্ভিসের বর্তমান কাঠামো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। (অ) প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সমরূপ বেতনক্রম কাঠামো গঠন করা হয়েছে। সার্ভিসকে ১। সাধারণ, ২। আর্থ, ৩। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী, এবং ৪। প্রশিক্ষণ — এই চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে সকল সরকারী চাকুরীজীবিকে (উৎপাদন খাত ব্যতীত) উপরোক্ত ৪টি শ্রেণীর বিভিন্ন পেশা ও বেতনক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে। (আ) কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ পদ ব্যতীত অন্যান্য পেশায় কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত যোগ্যতাকে খুব বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না। (ই) প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে সাধারণী ও বিশেষজ্ঞদের জন্য উন্মুক্ত একটি সার্ভিস গঠনের সুপারিশ আংশিকভাবে পুরণ হয়েছে। উন্মুক্ত কাঠামোর প্রায় ৪০% শতাংশ পদ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুরণ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজস্ব দপ্তরে কাজ করছেন। কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন আসেনি। নীতি নির্ধারণী পদে এখনও সাধারণী কর্মকর্তারা প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। [১৬]

গ) যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসে সাধারণী ধারণার প্রবর্তনঃ

৪.০. যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অধিক মর্যদা ও আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যুক্তরাজ্যের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের আমলাগণ নিজেদের সরকারী চাকুরীজীবি অপেক্ষা পেশাজীবি অথবা বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিতে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।[১৭] তাছাড়া যুক্তরাজ্যে যেখানে অধিকাংশ সরকারী চাকুরীজীবি মানবিক ও আইন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাধান্য দেখা যায়।[১৮]

৪.১. যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতি অনেকাংশে সিভিল সার্ভিসে বিশিষ্টতা আনয়নে সহায়তা করে। সেখানে সিভিল সার্ভিস কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এ পরীক্ষা প্রায়োগিক ও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী পরীক্ষার ন্যায় এ পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান ও যোগ্যতা নির্ণয় করা হয় না বরং আবেদনকারীদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কারিগরী দক্ষতা ও বর্তমান উপযুক্ততা নির্ণয় করা হয়।

৪.২. যুক্তরাষ্টে বিশিষ্টকরণের নেতিবাচক ফলস্বরূপ দেখা যায় নিজস্ব দপ্তরের উচ্চতর ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত একজন বিশেষজ্ঞ কংগ্রেসের উপ-কমিটির নিকট রাজনৈতিক ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে অস্বস্তি বোধ করেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে অপারগ হন।[১৯] তিনি নিজস্ব পেশার সদস্যদের নিকট সহজবোধ্য হন বটে কিন্তু রাজনৈতিকদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হতে পারেন না।

৪.৩. প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের সীমাবদ্ধতা দুর করার জন্যও প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে রাজনৈতিক নিয়োগ হ্রাসকল্পে কার্টার প্রশাসন ১৯৭৮ সালের প্রশাসনিক পুনর্গঠন আইন দ্বারা একটি উচ্চতর নির্বাহী সার্ভিস (Senior Executive Service) সংক্ষেপে এস, ই, এস, গঠন করে।[২০] এস, ই, এস, ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর প্রশাসনিক সার্ভিসের অনুরূপ একটি সাধারণী ব্যবস্থাপক শ্রেণী হিসেবে গঠিত হয়েছে। এস, ই, এস, এর সদস্যগণ কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম অথবা দপ্তরের প্রতি অনুগত না হয়ে সমগ্র সার্ভিস ও উন্নত ব্যবস্থপনা কৌশলের প্রতি অনুগত থাকেন।

৪.৪. যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের সাধারণ তালিকায় (general schedule) মোট ১৮টি গ্রেড রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট গ্রেড বিভিন্ন পেশাজীবিদের নিয়ে গঠিত এবং তারা নিজস্ব পেশার বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করতে পারেন।[২১]

৪.৫. একজন স্নাতক ডিগ্রীধারী সাধারণতঃ সাধারণ তালিকার পঞ্চম অথবা সপ্তম গ্রেডে ও একজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ৭ম অথবা ৯ম গ্রেডে প্রবেশ করেন। একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী একাদশ গ্রেডের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন হলে তিনি দ্বাদশ গ্রেডের গবেষণা পদে প্রবেশ করতে পারেন। সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপকগণ একাদশ ও দ্বাদশ গ্রেডে প্রাথমিক ভাবে নিযুক্ত হন।[২২]

৪.৬. উপরোক্ত সাধারণ তালিকার (general schedule) উর্ধে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাহী সার্ভিস (Federal Executive Service)। উক্ত সার্ভিসের পদসমূহকে পাঁচটি বেতন ক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে।[২৩] ১৯৭৮ সালের পূর্ব সময় পর্যন্ত অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাহী পদ রাজনৈতিক ভাবে পূরণকৃত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে এ, ই, এস,

গঠনের মাধ্যমে এ সার্ভিসের কিছু অংশ প্রশাসনিকভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৪.৭. সাধারণ তালিকার ১৬ থেকে ১৮ গ্রেড ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাহী সার্ভিসের চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রেডের কর্মকর্তারা এস, ই, এস, এ প্রবেশ করতে পারেন। এস, ই, এস, এর ১০ শতাংশ পদ রাজনৈতিক নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৪.৮. এস, ই, এস,–এ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কার্য মুল্যায়ন পদ্ধতি (Performance appraisal system) ব্যবহৃত হচ্ছে। বাৎসরিক কার্য মূল্যায়নের উপর এস, ই, এস, সদস্যদের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। দক্ষ ব্যবস্থাপকদের উৎসাহিত করার জন্য সম্মানজনক উপাধি ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। অন্য দিকে একজন কর্মকর্তার কাজের মুল্যায়ন সন্তোষজনক না হলে তিনি তার নিজস্ব পেশায় ফিরে যান।

৪.৯. একজন এস, ই, এস, সদস্য তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন এস, ই, এস, পদে বদলী হতে পারেন। এস, ই, এস, –এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী পেশার প্রতি মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের আগ্রহ সৃষ্টি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।

(ঘ) ফ্রেঞ্চ সিভিল সার্ভিসে সাধারণী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমতা রক্ষার প্রচেষ্টাঃ

৫.০. সাধারণী পক্ষপাত দুষ্ট বিট্রিশ পদ্ধতি ও বিশেষজ্ঞ পক্ষপাত দুষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে ফ্রেঞ্চ সিভিল সার্ভিসে এ দুইয়ের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।[২৪] যেমন প্রশাসনিক দিকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি কোর্ (corps) বা ক্যাডার রয়েছে। এ সকল কোর্ কে গ্র্যান্ডস্ কোর্ বলা হয়। গ্র্যান্ডস কোর্ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং এর সদস্যগণ নিজস্ব কোরের বাইরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কোরের উচ্চ প্রশাসনিক পদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যদিকে সার্ভিসের কারিগরী দিকে অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি কোর রয়েছে। প্রশাসকদের ন্যায় এ সকল কোরের সদস্যরা নিজস্ব কোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন কারিগরী কোরের উচ্চ পদের দায়িত্ব পালন করেন।

৫.১. ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ পদ্ধতির ন্যায় বিশেষজ্ঞরা শুধু প্রশাসকদের কারিগরী পরামর্শ প্রদান করেন না বরং তারা নিজেরাই প্রশাসনের দায়িত্বে থাকেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ/কারিগরী মন্ত্রণালয়ে (যেমনঃ পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা

মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় প্রভৃতি) কারিগরী কোরের সদস্যগণ প্রশাসনের নেতৃত্বে রয়েছে। ফ্রান্সে কারিগরী কোরের সদস্যরা যেহেতু অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেহেতু তাঁরা নীতি নির্ধারণ, প্রকল্প প্রণয়ন প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন।[২৫]

৫.২. ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন পরিচালকগণ। পরিচালকগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন এবং ডিরেক্টার ড্যু কাবিনেট (Director du Cabinet) মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক দিক নিদেশর্নার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ডিরেক্টার ড্যু কাবিনেট প্রশাসনের গ্র্যান্ডস্ কোরের উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন সদস্য। তিনি মন্ত্রী দ্বারা উক্তপদে নিয়োজিত হন ও সকল প্রশাসনিক ও কারিগরী বিষয়ে মন্ত্রীকে সহযোগিতা করেন।

৫.৩. ফ্রান্সে অধিকাংশ প্রশাসকেরই আইন বিষয়ক ডিগ্রী রয়েছে তবে এ ডিগ্রী যুক্তরাজ্যের ন্যায় উচ্চতর ডিগ্রী নয়। তথাপি প্রত্যেক প্রশাসকের আইন বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন কেন না সে দেশে প্রায় প্রতিটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক আদালতে উপস্থাপিত হতে পারে।

৫.৪. ফ্রান্সে কারিগরী ও প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে আহরণের জন্য প্রশিক্ষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা ইকোল্যে পলিটেকনিক (Ecole Polytechnique) ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জন করে। অন্যদিকে প্রশাসকগণ ইকোল্যে ন্যাশনাল ডি এডমিনিস্ট্রেশন (Ecole Nationale d' Administration ENA)-এর মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জনকরে।

৫.৫. ইকোল্যে পলিটেকনিক সাধারণভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও নির্দিষ্টভাবে অংক শাস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। উক্ত স্কুলে দু বছর অধ্যয়নের পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ও স্কুলের শ্রেষ্ঠ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ছাত্র সিভিল সার্ভিসের কারিগরী কোরে চাকুরীর সুযোগ পান। কারিগরী কোরের সর্বাধিক মর্যদা সম্পন্ন দু'টি কোর্ যেমন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার্স ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররা সুযোগ পান। এর পর শিক্ষানবীশ প্রকৌশলী হিসেবে তারা দু'বছর মেয়াদী পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৫.৬. ইকোল্যে ন্যাশনাল ডি এডমিনিস্ট্রেশনে প্রবেশের জন্য আবেদনকারীরা প্রশাসনের চারটি ক্ষেত্র- ১। সাধারণ প্রশাসন, ২। পররাষ্ট্র সার্ভিস, ৩। আর্থ প্রশাসন, ও ৪। সামাজিক প্রশাসনের যে কোন একটির জন্য আবেদন করেন। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তবে এ সকল পরীক্ষার তিন-চতুর্থাংশ নম্বর

সাধারণ বিষয় যেমন ভুগোল, আইন, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, মৌখিক পরীক্ষা, শারীরিক সুস্থতা প্রভৃতির জন্য সংরক্ষিত থাকে।

৫.৭. পরীক্ষায় কৃতকার্যদের তিন বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম বছরে শিক্ষানবীসদের প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাদেশিক জেলায় (prefecture) পাঠানো হয়। দ্বিতীয় বছর ইকোল্যে ন্যাশনাল ডি এডমিনিষ্ট্রেশনে প্রশাসন সম্পর্কিত বক্তৃতা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। দ্বিতীয় বৎসরান্তে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্ নির্দিষ্ট করা হয়। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ শিক্ষানবীস কর্মকর্তা গ্র্যান্ডস্ কোরসমুহে সুযোগ পান। অন্যরা প্রশাসনের অন্যান্য পদে অথবা সেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তৃতীয় বছর প্রশিক্ষণার্থীরা পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা নির্দিষ্ট দপ্তরে যোগদান করেন এবং এক থেকে দুই বছর শিক্ষানবীস কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।

ঙ) উপসংহার – বাংলাদেশে সাধারণী বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ নিরসনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ :

৬.০. বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সিভিল সার্ভিস কাঠামো পর্যালোচনার পর দেখা যায় সাধারণী – বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ নিরসনে দুইটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এক, প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ; দুই, প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি গতিশীল ও উচ্চতর প্রশাসক/ব্যবস্থাপক শ্রেণী গঠন।

৬.১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিশিষ্টতা আনয়ন ও নীতি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারেঃ–

১। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ''প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার'' উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রেষণ ও বদলীকালে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা প্রভৃতির প্রাসঙ্গিকতার উপর যথা সম্ভব গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

২। সরকারী কর্মকর্তাদের দু'বছর মেয়াদী শিক্ষানবীস কালে পর্যায়ক্রমে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ (ছয় মাস ব্যাপী), পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (এক বছর মেয়াদী) ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (৬ মাস ব্যাপী) অন্তভূক্ত করা যেতে পারে।

১৯৮০ সালে একীভূত ক্যাডার সার্ভিস (unified cadre service) গঠনের ফলে– বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সকল ক্যাডার সার্ভিসের জন্য বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮২ সালের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কারণে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্য সংখ্যা ও সার্ভিসের নিয়োগ পদ্ধতির তুলনায়

প্রশিক্ষণ সুবিধা অপ্রতুল হওয়ায় অপ্রশিক্ষণের জের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপ্রশিক্ষণের জের হ্রাস করার জন্য ১৯৮৮ সাল থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে ২ মাসে হ্রাস করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন–কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ওটিআই প্রভৃতিকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব দেয়াহয়েছে।

অপ্রশিক্ষণের জের থাকা সত্ত্বেও ১৯৯২ সাল থেকে নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা আছে। অপ্রশিক্ষণের জের হ্রাসের জন্য পাশাপাশি অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দু মাস মেয়াদী বুনিয়াদী কোর্স চলতে পারে। পরবর্তীতে নব নিযুক্তদের জন্য বুনিয়াদী কোর্স ৪ মাসে থেকে ৬ মাস উন্নীত করা যেতে পারে।

৩। সকল ক্যাডারের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

৪। কর্মকর্তাদের জৈষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নে বুনিয়াদী ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের ফলাফলকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৫। বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কর্মকর্তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অপেক্ষা কাজের মানকে অধিক গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

৬। সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে যথাসম্ভব সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

৭। সিভিল সার্ভিসের বদলী নীতি জনগণ ও কর্মকর্তাদের কল্যানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদে তিন থেকে পাঁচ বছর (কাজের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে) অন্তর বদলী করা যেতে পারে।

৮। প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপক শ্রেণী তৈরী করার জন্য সাধারণী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সিনিয়র পলিসি পুল গঠন করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতেপারে।

৯। পুলের সদস্য নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রধান ভুমিকা পালন করতে পারে। কমিশন নির্বাচনী পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার/শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্ম অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব দানে সক্ষম ও প্রশাসনিক যোগাযোগে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।

১০। পুলের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সাথে যথা সম্ভব সংগতি পূর্ণ বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১১। পুলের যে সকল সদস্যের সচিবালয়ে চাকুরীর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সে সকল সদস্যদের পুলে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রশাসন ও সচিবালয় সার্ভিস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন।

১২। নিজস্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জনে আগ্রহী পুল বহির্ভূত কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের উন্নয়ন ও পদন্নোতির ক্ষেত্রে পুলের কোন নেতিবাচক ভূমিকা থাকা উচিৎ নয়।

৬.২. মনে রাখতে হবে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি- প্রভৃতি ব্যতীত উপরোক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ দ্বারা সিভিল সার্ভিসে প্রাসঙ্গিকতা ও বিশিষ্টতা আনয়ন সম্ভব না। আমাদের দেশে চাকরীর স্বল্পতা ও প্রযুক্তিগত অনুন্নয়নের ফলে দেখা যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষা বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা কর্ম ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও সঠিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১) Great Britain, Fulton Report Vol.1 (London: H.M. Stationery Office, 1968), পৃ ঃ ১৬, অনুঃ ৩।

২) Gavin Drewry and Tony Butcher, The Civil Service Today (Oxford: Basil Blackwell, 1988), পৃ ঃ ২৫

৩) R.G.S. Brown, The Administrative Process in Britain (London: Methuen and Co. Ltd. 1971), পৃ ঃ ৬৮

৪) Great Btitain, পূর্বোক্ত, অনুঃ ৩ পৃঃ ৯,দেখুন, Mohammad Mohabbat Khan, Bureaucreatic Self Preservation (Dhaka ,University of Dhaka, 1980).

৫) Great Britain, পূর্বোক্ত। , অনুঃ ৪।

৬) ঐ, পৃ ঃ ১২১।

৭) ঐ, পৃ ঃ ১১৯।

৮) ঐ, পৃ ঃ ৯ অনুঃ ৩।

৯) দেখুন, Ralph Braibanti, " The Higher Bureaucracy of Pakistan" in Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition. ed. Ralph Braibanti (Durham: Duke University Press, 1966), পৃঃ ২০৯-৩৫৩ ও Mohammad Mohabbat Khan, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯০-১১১।

১০) Ali Ahmed, Role of Higher Civil Servants in Pakistan (Dhaka: NIPA, 1968), পৃঃ ১৩০-১৩৫।

১১) ঐ, পৃঃ১৩৬।

১২) দেখুন, Ali Ahmed, Basic Principles and Practices of Administrative Organization: Bangladesh (Dhaka : NILG, 1981), পৃঃ ৩৬-৩৭।

১৩) Bangladesh, Personnel Manual (Dhaka: Ministry of Establishment, 1989), পৃঃ ২২-২৫

১৪) Great Britain, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯ অনুঃ১

১৫) ঐ, পৃঃ ১৬ অনুঃ৩১

১৬) Drewry and Butcher, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২ ও ১৪১-১৪৩।

১৭) Hugh Heclo, "In Search of a Role: America's Higher Civil Service", in Bureaucrats policy Making ,ed. Ezra N. Suleiman (New York: Holmes and Meier, 1984), পৃঃ ১১।

১৮) ঐ, পৃঃ১৫।

১৯) Great Britain, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪৫।

২০) দেখুন, U.S. A. ," The Civil Service Reform Act of 1978 (Public Law 95-954)" in Legislating Bureaucratic Change : The Civil Service Reform Act of 1978 ed. Patricia W. Ingraham and Carolyn Ban (New York: state University of New York press, 1984), পৃঃ ২৮১-৩৯৭

২১) Great Britain, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪০-১৪৭।

২২) ঐ

২৩) ঐ

২৪) দেখুন, Great Britain, পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৩৩ ও Ridley and Blondel, Public Administration in France (London: Routledge and kegan Paul, 1969), পৃঃ ৩৬-৪১

২৫) Ridley and Blondel, ঐ,পৃঃ ৬১।

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ

জোবায়ের এনামুল করিম

ভূমিকা

১.১. সাধারণতঃ স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্থানীয় ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। জাতীয় সরকারের মতো স্থানীয় সরকার সার্বভৌম কোন প্রতিষ্ঠান নয়। স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা জাতীয় সরকার আইন ও বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। এছাড়াও জাতীয় সরকার বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট এলাকায় কর,ফি, টোল প্রভৃতি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে থাকে।[১] সাধারণ অর্থে স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায় বুঝায়–যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে।[২]

১.২. তত্ত্ববিদগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা অথবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ স্থানীয় সরকার বলতে এমন এক জনসংগঠনকে বুঝায় যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমারেখায় একটি দেশের অঞ্চল ভিত্তিতে বা জাতীয় সরকারের অংশ হিসাবে কাজ করে।[৩] ১৯৪০ দশকে জি মনটাগো মরিস 'স্থানীয় সরকার' এর সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করে দুই পদ্ধতির স্থানীয় সরকার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থা সমূহ যারা সরকারের এজেন্ট বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়তঃ 'স্থানীয় সরকার' কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকার সমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার হতে এই

প্রতিষ্ঠান সমূহকে কিছু কিছু ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলী দেয়া হয় যা কার্যকর করতে তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।[৪] মনটাগো মরিস এর মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে, এ দু'টো পদ্ধতি মোটামুটিভাবে পাশাপাশি বা পৃথকভাবে অধিকাংশ দেশ সমূহে বিরাজমান।

১.৩ 'স্থানীয় সরকার' সম্পর্কীয় উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সংজ্ঞাগুলো ' স্থানীয় সরকার'কে সরাসরি পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরেছে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চার্লস ব্যারই এর সংজ্ঞা বাস্তবের সাথে কিছুটা সামজ্ঞস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর মতে স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট স্বীয় এলাকায় (ভৌগলিক সীমারেখার) সীমাবদ্ধ থাকে, দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় কর ধার্য করতে পারে, যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে ।[৫] অতএব, 'স্থানীয় সরকারের' বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে এর নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা ও জনসমষ্টি, জনপ্রতিনিধিত্ব, নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ। জাতীয় সরকারের নিজের পক্ষে কেন্দ্র থেকে সবসময় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না এবং নেতৃত্ব বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিতকরণ, জনমত যাচাই ও জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এজন্যই বিশ্বের প্রায় সকল দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজ করছে।

১.৪. বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো রয়েছে তার সূচনা হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত কিছু কিছু আইনের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহর অঞ্চলে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয় ।[৬] বৃটিশ শাসন আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের কাঠামো পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। এ প্রবন্ধ গ্রামীণ স্থানীয় সরকার স্তরগুলোকে বিভিন্ন আইনের আওতায় একসংগে আলোচনা না করে স্তরগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলো যাতে প্রত্যেকটি স্তরে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অতিসহজেই ধারণা করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী

এলাকায় তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাজ করছে। এগুলোর বিবর্তন, গঠন বা কাঠামো, কার্যাবলী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

ইউনিয়ন পরিষদ

২.১. অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্থানীয় সরকার সংস্থা একটি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার।[৭] আজকের ইউনিয়ন পরিষদ সংগঠিত হয়েছে ১৯৮৩ সালে জারীকৃত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে।

২.২. ইংরেজদের আগমনের পূর্বে তৎকালীন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে খুব একটা নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না।[৮] তবে পন্ডিতগণ মনে করেন গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচজন। পঞ্চয়েত গ্রামের গণ্যমাণ্য বয়স্ক লোকদের নিয়ে গঠিত হত।[৯] সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। পঞ্চায়েতগুলো দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেরাই সম্পদ আহরন করতো।[১০] এই পঞ্চায়েত বা গ্রাম সরকারগুলো যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। অতএব এর কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না।

২.৩. ইংরেজ শাসনামলে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং পল্লী অঞ্চলে ইংরেজদের ভিত্তি আরো দৃঢ় করার জন্য লর্ড মেয়োর এর আমলে ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এর ফলে প্রথমবারের মতো পল্লী অঞ্চলে আইনগত ভিত্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং পঞ্চায়েত প্রথার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই আইনের অধীনে পল্লী অঞ্চলকে ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়। কয়েকটি গ্রামকে ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এবং প্রতিটি ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল। প্রতিটি ইউনিয়নে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সদস্যের সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সকল সদস্যকে তিন বৎসরের জন্য নিয়োগ প্রদান করতেন। যদি কোন নিয়োগকৃত সদস্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন তবে তাকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা দিতে হ'ত। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তি–শৃংখলা রক্ষার্থে চৌকিদার নিয়োগ করা এবং চৌকিদারী কর আদায়ের মাধ্যমে চৌকিদারদের বেতনের ব্যবস্থা করা। এই করের সর্বনিম্ন হার ছিল ছয় আনা।

যদি কোন পঞ্চায়েত কোন সময় চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতে অক্ষম হতেন, তবে সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পতি ক্রোক করে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল।

২.৪ চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ত্রুটিমসূহ হচ্ছেঃ এর সদস্যগণ গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন। [১১] তারা চৌকিদারী কর আদায় বা তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, চৌকিদারদের অনেক সময় বেতন দিতেন না। তাছাড়াও জনকল্যাণ মূলক কাজের দায়িত্ব চৌকিদারী পঞ্চায়েতের ছিল না। সর্বোপরি পঞ্চায়েতগুলি মূলতঃ আইন ও শৃংখলা রক্ষার্থে এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়। এই অসুবিধা সমূহের দরূন চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় অধিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ১৮৮৫ সালে বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন প্রবর্তনের ম্যধমে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়।

২.৫. কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৯ জন এবং সদস্যগণ গ্রামবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হতেন ।[১২] এদের কোন কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এরা রাস্তা তৈরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধাদির তত্ত্বাবধান করতো ।[১৩] এই তদারকী খরচ মেটানোর জন্য গ্রামবাসী (যাদের বাড়ী বা সম্পত্তি ছিল) নিকট হতে তহবিল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[১৪]এর মূলতঃ জেলা বোর্ডের অনুদানের উপর নির্ভশীল ছিল–ফলে জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। কর আদায়ের ক্ষমতা না থাকায় আর্থিক দূর্বলতার দরূন ইউনিয়ন কমিটি কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া, ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত কাজ করতো এবং গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কর আদায় করা হতো। ফলে পল্লী অঞ্চলে দ্বৈতশাসনের অসুবিধা প্রকটভাবে দেখা দেয় এবং ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন এর অধীনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। মোট সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ হতে জেলা প্রশাসক মনোনয়ন করতেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস–প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তা বিধান, রাস্তা

ও পুল /কালভার্ট নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল সংরক্ষণ, পানি সরবরাহ এবং জেলা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন কর আরোপ এবং ছোট খাট ফৌজদারী অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। বোর্ডের কার্যকাল প্রথমে (১৯১৯ সাল থেকে) ছিল ৩ বৎসর যা ১৯৩৬ সাল থেকে ৪ বৎসর করা হয় এবং মনোনয়ন প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সংরক্ষিত ভোটাধিকার, প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি এবং জেলা পরিষদের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতাই ছিল প্রধান।[১৫]

২.৬. মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এর অধীনে ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং এর গঠন, কার্যবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে।[১৬] গড়ে ১০, ০০০ (দশ হাজার) লোকের বসবাসকারী এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয় । মোট সদস্য সংখ্যার দুই – তৃতীয়াংশ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং মহকুমা প্রশাসক সরকারের পক্ষ হতে অবশিষ্ট এক–তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনয়ন করতেন। ১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মনোয়ন প্রথা রহিত করা হয় । সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস–চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ভাইস–চেয়ারম্যানের পদটি বাতিল করা হয় । ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর। এলাকার শান্তি–শৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও ৩৭ টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়–তন্মধ্যে কৃষি উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজ কল্যান–প্রভৃতি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সালিশী আদালত গঠন করার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেয়া হয় ১৯৬১ সালে। মুসলিম পরিবারিক ও বিবাহ আইনের অধীনে এর সদস্যদেরকে বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠন করার জন্য চৌকিদারী কর ছাড়াও সম্পত্তির উপর করসহ অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। এছাড়া পল্লীপূর্ত কর্মসূচীর অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন বা অন্যান্য কাজের জন্য সরকার হতে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলো – সরকারী কর্মকর্তাদের আধিপত্য, সদস্যগণ কর্তৃক সরকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করা, আর্থিক দুর্বলতা, দূর্নীতি এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে ঠিকমত দায়িত্ব পালনে অধিকাংশ সময় এই প্রতষ্ঠান ব্যর্থতার পারিচয় দিয়েছে।[১৭]

২.৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -- ৭, ১৯৭২ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় ।[১৮] রাষ্ট্রপতির আদেশ নং –

২২,১৯৭৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এর নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ৯ জন সদস্য, একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস– চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[১৯] স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে বেশ পরিবর্তন ঘটে। ভাইস–চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করা হয়। একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এছাড়া দুইজন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দুইজন প্রতিনিধি সদস্য (কৃষকের মধ্য থেকে) পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর উপর ৪০ টি কাজ ন্যস্ত করা হয়। প্রধান প্রধান কাজগুলো হচ্ছেঃ– জনকল্যাণ, আইন ও শৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব, উন্নয়নমূলক এবং বিচার বিভাগীয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ বিধির অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলী ছাড়া অনেক অনির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। যেমনঃ জাতীয়তা প্রত্যয়ন পত্র, চরিত্র প্রত্যয়ন পত্র, আয় প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি দেয়া এবং আদম শুমারী কাজে সহায়তা করা।[২০] কিন্তু এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্রের অনুরূপ থেকে যায়।

২.৮. ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ প্রবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও নিজস্ব আয়ের উৎসের পরিবর্তন ঘটেছে। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের (নং –৫১/৮৩) ৩০ এবং এর প্রথম সিডিউলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী বর্ণনা করা হযেছে। এসব কার্যাবলী ছাড়াও রয়েছে–(ক) সাধারণভাবে সকল ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বা কোন বিশেষ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক করণীয় বলে জাতীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত কার্যাবলী, (খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলী, (গ) অপর যে কোন আইন প্রদত্ত এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রযোজ্য অন্যান্য কার্যাবলী আইনে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব। কিন্তু নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি হতে কমিয়ে ৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ঃ– (১) বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর (২) গ্রাম্য পুলিশ রেট, (৩) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি, (৪) জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, এবং (৫) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং জাতীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর তাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল হতে হয়েছে।[২১]

২.৯. ৩৩ নং ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি, শিল্প ও গোষ্ঠী উন্নয়নে " প্রেসক্রিপশন' মতে কাজ করবেন। পরিষদ পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন এবং যেসব কার্যাবলী প্রেসক্রাইব করা হবে তা করবেন।

২.১০. এসব কার্যাবলী ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার আইনে বর্ণিত কার্যাবলীর হুবহু অনুসরণ। তালিকাটির সতর্ক পঠন থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এটা কোন অগ্রাধিকারের ভিত্তি রচিত হয় নি। এমন কি আইনের ৩০ থেকে ৩৪ ধারায়, বর্ণিত কার্যবিভাগের ক্রমানুসারেও তা রচিত নয়। অনেক আইটেম যুগের প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে পূণর্লিখিত হওয়া আবশ্যক এবং কোন কোন আইটেম বর্জনীয়। অন্যদিকে আইনে লিখিত হয়নি কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সেগুলো স্থানীয় বিভাগের নির্বাহী আদেশ বলে অবশ্য করণীয় কাজ হয়েছে। নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমেই ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে গঠনমূলক কার্যাদির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

স্বনির্ভর সরকার

৩.১. ১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ।[২২] এ উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার (গঠন ও প্রশাসন) বিধি তৈরী করা হয় ।[২৩] এ বিধি অনুযায়ী পর্যায়াক্রমে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলা সহ মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাম প্রধান ও সকল সদস্যই গ্রাম সভার সদস্যদের মতৈক্যের উপর ভিত্তি করে মনোনীত হতেন। গ্রাম প্রধান সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের প্রধানতঃ ৪ টি কাজ ছিলঃ– (১) অধিক খাদ্য উৎপাদন, (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (৩) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, এবং (৪) আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা। যদিও এ প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট দায়িত্বাবলী দেয়া হযেছিল যদিও কোন আর্থিক সাহায্য বা নিজের আয়ের জন্য কর ধার্য্যের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কাজেই আর্থিক অসুবিধা এবং আবশ্যিক ক্ষমতার অভাবে এ প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে নেতৃত্বের কোন্দল এবং প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ গ্রামঞ্চলে প্রকটভাবে দেখা দেয় ।[২৪] ১৯৮২ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি হয়।

উপজেলা/ পরিষদ

৪.১. যদিও ১৯৫৯ সালের পূর্বে থানা বা বর্তমান উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন করা হয় নি, তথাপিও বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন, ১৯৮৫ অনুযায়ী

মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এই লোকাল বোর্ড কমপক্ষে ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ইহার ২/৩ অংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ১/৩ অংশ মনোনীত হতেন। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। অবশ্য তাঁর নিযুক্তির ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এর অনুমোদন লাগতো। লোকাল বোর্ডের কোন নির্দিষ্ট কার্যাবলী বা দায়িত্ব এবং আয়ের উৎস ছিল না। জেলা-বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো এবং জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্বাবলী পালন করতো। এই প্রতিষ্ঠান জেলা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলীর তদারক এবং অনুদান বন্টন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন গ্রহণ ছিল এর অন্যতম কাজ। যদিও ১৯৯১ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন এর অধীনে লোকাল বোর্ডের অস্তিত্ব বজায় ছিল, ১৯৩৬ সালে এর বিলুপ্তি ঘটে। কারণ জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাবলী, আর্থিক অনুদান বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ করতো এবং লোকাল বোর্ডকে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের মাঝে একটি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৫]

৪.২. ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর অধীন সর্বপ্রথম থানা/ উপজেলা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই কাউন্সিল প্রতিনিধি ও অফিসিয়াল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। একটি থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন সমূহের চেয়ারম্যানগণ- প্রতিনিধি সদস্য এবং মহকুমা প্রশাসক, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), থানা পর্যায়ের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য ও সমবায় কর্মকর্তাগণ-অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন। মহকুমা প্রশাসক এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) যথাক্রমে ইহার চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। থানা কাউন্সিলকে ৭ টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন ঃ- (১) থানার অর্ন্তগত সকল উন্নয়ন কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, (২) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন,(৩) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, (৪) ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের কাজে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান, (৫) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, (৬) পরিবেশ মুক্ত রাখা এবং (৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত কার্যাবলী মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে উল্লেখ করা থাকলেও থানা কাউন্সিল নির্দিষ্ট করে কোন কাজ করত না। এর মূখ্য কাজ ছিল থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির কার্যাবলীয় সমন্বয় সাধন করা। এছাড়া সরকার এবং জেলা কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব থানার কাউন্সিল পালন করতো। তহবিল গঠনের জন্যে থানা কাউন্সিলকে কোন কর ধার্য বা আদয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এই সংস্থার কার্যাবলীর জন্য সকল ব্যয় সরকার বহন করতো। উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, থানা কাউন্সিল স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ না করে সরকারী আমলাতন্ত্রের

একটি প্রসারিত হস্ত হিসেবে কাজ করতো।[২৬] স্বাধীনতা উত্তরকালে থানা কাউন্সিলের পরিবর্তন ঘটে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ এবং স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী যথাক্রমে নামকরণ করা হয় থানা উন্নয়ন কমিটি এবং থানা পরিষদ। কিন্তু গঠন, কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অনুরূপ রয়ে যায়।

৪.৩. সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পূর্ণগঠন) অধ্যাদেশ জারী করেছেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, আফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।[২৭] উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের ভোটাধিকার আছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও মনোনীত সদস্যগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করেন।

৪.৪. ১৯৮২ সালে সরকারী রেজুলিউশন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কার্যাবলীকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়–সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় সমূহ। এই রেজুলিউশন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার সংরক্ষিত বিষয়াদি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়মূলক কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। হস্তান্তরিত বিষয় ১০ টি। কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারণ, পশুপালন ও মৎস্য সম্প্রসারণসহ সংরক্ষিত কাজের তালিকা অনুযায়ী সরকার ১৩ টি দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন – আইন–শৃংখলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার, রাজস্ব– প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন ও খনিজ উন্নয়ন ইত্যাদি। অতএব সরকার পূর্বের থানা পরিষদের তুলনায় উপজেলা পরিষদকে অনেক বেশী দায়িত্ব দিয়েছেন।[২৮]

৪.৫. বিধান অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে প্রকল্প গ্রহণের অনুমতির জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হ'তে হয় না পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে। পরিষদের দায়িত্ব পালনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ, ডি, পি) থেকে প্রতি আর্থিক বৎসর সরকারী আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।[২৯] এছাড়া একে কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ৮ টি।

যেমন ঃ– জলমহল, হাট–বাজার, ফেরী, ব্যবসা বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এ পদ্ধতির আওতায় হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের কর্মকর্তাদেরকে উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষয়াদির কর্মকর্তাদেরকে (মুনসেফ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া) প্রয়োজন বোধে উপজেলা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা, বাজেট ও কর ধার্য, প্রস্তাব অনুমোদন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উপজেলা পরিষদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।[৩০]

৪.৬. ইতিপূর্বে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো সাধারণতঃ আমলাগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, ফলে অনেক সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর বিকাশ সাধনে এটা একটা বাঁধা স্বরূপ ছিল। উপজেলা পদ্ধতিতে এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছিল। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ বা 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে কিছু নেই। একটা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিষদ তার সব কর্মকান্ড নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। পরিষদ আমলা নির্ভর নয় এমনকি সরকারী সহায়তা তহবিলের ক্ষেত্রেও আমলাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে তার সম্পর্ক কার্যাদির বিষয়ে খবরাখবর নেয়া, মূল্যায়ন; পরিদর্শন, কারিগরি উপদেশ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ।[৩১]

৪.৭. জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে যাতে উপজেলা পরিষদগুলো তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প তৈরীর সময় খাতওয়ারী বরাদ্দ সঠিকভাবে পালন করেন তার জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিষদকে আদেশ দিয়ে থাকেন। এ উপদেশমালার বিশেষ দিক হচ্ছেঃ[৩২]

(ক) উপজেলা পরিষদগুলো যাতে জাতীয় অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে উন্নয়ন সহায়ক তহবিল দ্বারা উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে;

(খ) উপজেলা পরিষদ যাতে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ;

(গ) উপজেলা পরিষদ যাতে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ না দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ কম দেখায়;

(ঘ) যাতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় জনসংখ্যা, এলাকা, অনগ্রসরতা, পূর্ববর্তী সময়ে সফলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি দেখে প্রকল্প নেয়া হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করে; এবং

(ঙ) স্থানীয় ভাবে তহবিল গঠন করে তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করা ইত্যাদি।

জেলা পরিষদ

৫.১. ইংরেজ শাসন আমলে বঙ্গীয় স্থানীয় সায়ত্বশাসন আইন, ১৮৮৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সর্বপ্রথম জেলা বোর্ড নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। জেলা বোর্ড নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হ'ত। মোট সদস্যদের দুই–তৃতীয়াংশ লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে নতুবা বাহির হ'তে নির্বাচন করতেন। অবশিষ্ট এক–তৃতীয়াংশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার মনোনয়ন দিতেন। অতঃপর জেলা বোর্ডের সকল সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন অথবা প্রাদেশিক সরকারও সরাসরি চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন। তবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন ব্যতীত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারতেন না। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ায় জেলা বোর্ডের দুই–তৃতীয়াংশ সদস্য যোগ্য ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। জেলা বোর্ডের মূল কার্যাবলী ছিল–প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলাকায় সড়ক এবং পুল নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন দায়িত্ব পালন ইত্যাদি। এর মূল আয়ের উৎস ছিল ৩টি যেমনঃ চেস, ফি এবং বিধান লংঘনের জন্য জরিমানা ও সরকারী অনুদান।[৩৩]

৫.২. ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন জেলা বোর্ডের গঠনের ক্ষেত্রে কিছুটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আনার বিধান করেছিল। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের সদস্যেরা সরাসরি ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং এক বা দুই জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। কিন্তু সদস্যরা ১৮৮৫ এর আইন অনুযায়ী নির্বাচিত বা মনোনীত হতেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালে জেলা বোর্ড–এ সদস্য মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয়। জেলা বোর্ডকে পূর্বের কার্যাবলীর সাথে জন্ম–মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ এবং ডাকবাংলা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। পূর্বের ৩টি আয়ের উৎসের সাথে ফেরী ব্যবহারের জন্য ফি আদায়ের ক্ষমতা এবং মটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স এর আয়ের অংশ সরকার হতে জেলা বোর্ডের জন্য দেয়ার বিধান করা হয়।[৩৪]

৫.৩. ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী জেলা বোর্ডের নামকরণ করা হয় জেলা কাউন্সিল। অফিসিয়াল ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হতো। [illegible]া কাউন্সিলে মোট সদস্যের অর্ধেক জেলার অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও টাউন [illegible]র চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট অর্ধেক সদস্য সরকার নিয়োগ [illegible]তেন। জেলা প্রশাসক জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ভাইস–চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জেলা কাউন্সিলের দায়িত্ববলীর মধ্যে ছিল সড়ক, ভবন, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী

নলকূপ, ডাকবাংলার সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদ সমূহেরে তৎপরতার সমন্বয় সাধন করা। সরকারী অনুদান ছাড়াও কর, টোল, ফি-ইত্যাদি ধার্যের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্টপতি আদেশ নং -৭, ১৯৭২-এ জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড করা হয়।

৫.৪. ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। নির্বাচিত, অফিসিয়াল এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা থাকে। নির্বাচিত ও মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পর কখনও জেলা পরিষদের নির্বাচন হয় নি। জেলা প্রশাসক ও সহকারী পরিচালক স্থানীয় সরকার, যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, রেষ্ট হাউস নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা। তা ছাড়া, জেলা পরিষদ স্বেচ্ছায়-সমাজ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলীও সম্পাদন করতে পারতো। সরকারী অনুদান ছাড়াও কর টোল, ফি ইত্যাদি ধার্যের মাধ্যমে তহবিল গঠনের বিধান ছিল।[৩৫]

৫.৫. স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন ২২টি সাবেক জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল। জেলা পরিষদ পুনঃসংগঠিত হওয়ায় ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭ (২) (এ) (।।) ধারায় বিধান অনুসারে উক্ত ২২টি জেলা পরিষদ শুধুমাত্র জেলা প্রশাসককে নিয়ে সংগঠিত হওয়ায় জেলা প্রশাসকই চেয়ারম্যান হিসেবে পরিষদের কাজ চালিয়ে যেতেন। ইতিমধ্যে আরোও ৪২ টি নতুন জেলা সৃষ্টি হওয়ায় জেলার মোট সংখ্যা দাড়ায় ৬৪। নবসৃষ্ট ৪২টি জেলায় জেলা পরিষদ গঠন করা হয়নি বলে জেলাগুলো উপরোক্ত ২২টি সাবেক জেলা পরিষদের আওতাধীন ছিল। জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি ফোরাম থাকার প্রয়োজনে দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩৬] এই লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছেন। এ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকার রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।[৩৭] সরকার ৬৪ টি

জেলা পরিষদের মধ্যে ৬১ টি জেলা পরিষদে তিন বৎসরের জন্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন। ।[৩৮] প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য এবং কর্মকর্তা সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদের কোন সভায় কর্মকর্তা সদস্যদের ভোটাধিকার নেই ।[৩৯] চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান রূপে দায়িত্ব পালন করবেন ।[৪০]

৫.৬. এই আইনের প্রথম তফসিল অনুযায়ী জেলা পরিষদের কার্যবলী দুই প্রকারেরঃ– আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যবলী ১২ টি এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী ৬৯টি। আবশ্যক কার্যবলী হচ্ছে–জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগ এর পুনরীক্ষণঃ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের পর্যলোচনা ও হিসেব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উম্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ, অর্থনৈতিক, জনস্বাস্থ্য. গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদ বিধি বা সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষে তহবিলের সংগতি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী ইচ্ছে করলে সম্পাদন করতে পারবেন, তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে জেলা পরিষদ যে সকল ঐচ্ছিক কার্যাবলী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করবে। এ ছাড়া, বিধি অনুযায়ী এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারেন। সরকার সময় সময় নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করতে পারবেন ।[৪১] তবে জেলা পরিষদের সকল কার্যাবলী বিধিদ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে কমিটি সমূহের সভাপতি অথবা চেয়ারম্যান, সদস্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদন করতে হবে। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকালে জেলা পরিষদ সরকারের পূর্ব

অনুমোদনক্রমে এই আইনের বা কোন বিধি বিধানের সংগে অসামঞ্জস্য না হয় এই রূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। এবং তৃতীয় তফসিলে বিধানের কোন কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজের জন্য দন্ডিত করতে পারবে। তবে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য জেলা পরিষদ অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটতে থাকে তাহলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।[৪২]

৫.৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রসংগে তহবিল গঠন ও ব্যয়, নিজস্ব উৎস সমূহ, বাজেট তৈরী ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা পরিষদের তহবিলে ৯টি উৎস হতে অর্থ জমা হবে। যেমনঃ-(১) স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ দ্বারা গঠিত জেলা পরিষদ যে জেলা পরিষদের উত্তরাধিকারী সেই জেলা পরিষদের তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ, (২) জেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, (৩) জেলা পরিষদের সম্পত্তি হতে আয়, (৪) সরকারী অনুদান, (৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, (৬) জেলা পরিষদের উপর ন্যাস্ত সকল ট্রাষ্ট হতে প্রাপ্ত আয়, (৭) জেলা পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা, (৮) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ, (৯) সরকারের নির্দেশে জেলা পরিষদের উপর ন্যাস্ত অন্যন্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।[৪৩]

৫.৮. দ্বিতীয় তফসিলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদন ক্রমে ৮টি উৎস হতে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। উৎসগুলো হলো (১) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ, (২) বিজ্ঞাপনের উপর কর, (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল, (৪) জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস, (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেট, (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণ মূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস, (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।[৪৪]

৫.৯. যদিও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জেলা পরিষদ তার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে, কর্তকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রধিকারভিত্তিতে করতে হবে।[৪৫] বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলা পরিষদ প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বেই উক্ত বৎসরের জন্য বাজেট (সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী) প্রণয়ন ও

অনুমোদন করে সরকার ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করে। সরকার বাজেট প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে পারবেন এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেট জেলা পরিষদের বাজেট হিসেবে গণ্য হবে। জেলা পরিষদ যদি কোন অর্থ বৎসরের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে ব্যর্থ হয, তা'হলে সরকার উক্ত জেলা পরিষদের জন্য আয়–ব্যয় বিররণী প্রস্তুত করে তা প্রত্যায়ন করবেন এবং এই প্রত্যয়নকৃত আয় –ব্যয় বিবরণী জেলা পরিষদের বাজেট হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, জেলা পরিষদ কোন অর্থ বৎসর অতি–বাহিত হবার পূর্বেই বিধি অনুযায়ী সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বিভাগীয় কমিশনার ও সরকারের নিকট প্রেরণ করতে পারে।[৪৬]

৫.১০. জেলা পরিষদের তহবিলের অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংক অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধরিত অন্য কোন প্রকারে জমা রাখতে হবে। আয় ও ব্যয় হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে রাখতে হবে এবং প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হবার পর আয়–ব্যয় বিবরণী পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আয়–ব্যায় এর হিসেবে নিরীক্ষা করবেন। হিসেব নিরীক্ষার সময় নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেব সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও অন্যান্য দলিল দেখতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। হিসেব নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (ক) অর্থ–আত্মসাৎ, (খ) জেলা পরিষদের তহবিলের লোকসান, অপচয় ও অপপ্রয়োগ (গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, (ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাদের নাম উল্লেখ থাকবে।[৪৭]

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

৬.১. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে এক ধরনের জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল। এ পরিষদ সমূহ একই অধ্যাদেশের অধীনে পরিচালিত হতো। বর্তমানে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছাড়ি জেলা পরিষদ সমূহ পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রণীত হওয়ায় অপার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ (৬১টি) স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীনে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৪৮]

উপসংহার

৭.১. বাংলাদেশে ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন নামে কাজ করে এসেছে। সময় সময় বিভিন্ন আইন, আদেশ ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে এ সকল গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী ছাড়াও দায়িত্ব ও কার্যাবলীর পরিবর্তন ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সরকারী দপ্তর সমূহের পাশাপাশি দীর্ঘদিন কাজ করে আসলেও নানাবিধ কারণে এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ সকল কারণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকার উপর গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা, কার্য স্বাধীনতা (অপারেটিভ ফ্রিডম), বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ও দুর্বলতা, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারে অনীহা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প চিহ্নিত করণ ও বাস্তবায়নে অনুভূত চাহিদা এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব না দেওয়া, সরকারী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলীর অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪৭]

৭.২. ১৯৮২ সালে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে সংস্কাররমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উপজেলা পরিষদ গঠন , ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন এবং আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের নিকট ন্যস্তসহ যথেষ্ট কার্যস্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। গ্রামবাসী বা গ্রাম এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে অনুভূত চাহিদার নিরীখে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এ ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্তরকে উর্দ্ধতন পরিষদ কর্তৃক সাহায্য, সাহযোগিতা ও উপদেশনা দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে সরকার বা তার প্রতিনিধির (সরকারী কর্মকর্তা) যে প্রাভাব/কর্তৃত্ব বিভিন্ন স্তরের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সমূহের উপর ছিল তা সীমিত করে জনপ্রতিনিধিকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব বহুলাংশে দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি স্থানীয় সরকার স্তরের কার্যাবলী ও দায়িত্ব এবং নিজস্ব আয়ের উৎস সমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং প্রতিবছর সরকারী অনুদান দেয়া হচ্ছে। দায়িত্ব অনুযায়ী তহবিল সংকট হয়তো এখনো রয়ে যাবে কারণ এর নিজস্ব আয়ের উৎস বাস্তব ক্ষেত্রে সীমিত এবং আমাদের মত গরীব দেশের সরকারের পক্ষে সব সময় চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান তাদেরকে দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই এ সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকলকে স্থানীয়

সম্পদ আহরণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে নতুবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী পালনে বিঘ্ন ঘটবে।

৭.৩. গ্রামীণ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকার সংস্কারমুলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের উপর গ্রামীণ জনগণের সমস্যা নিরসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে সম্পাদন করলে গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ পল্লী এলাকা সমূহের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

পাদটিকা ঃ

১। বিলকিস আরা আলম ও কে, কে, উ, আজম (সম্পাদিত), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল, (ঢাকাঃ এন আই এল জি, ১৯৮৭) পৃঃ১।

2. William A-Robson, Encyclopedia of Social Science, Vol. 9 & 10

3. Montagu Harris, Comperative Local Government (London: Hutchinson's University Library, 1948) P.9.

4. S. E. Finer, quoted in (Md. Afsar Hossain Saqui, "Local Government Research in Bangladesh" in Local Government Quarterly. Vol. No-4, December 1972) P.8.

5. Charels Barrett quoted in Q: Md. Afsar Hossin Saqui, Op. Cit, P.8.

6. For detail discussion please see Q. M.d. Afsar Hossain Saqui, op cit,Dr. Ali Ahmed, Administration of Local Self Government for Rual Areas in Banladesh (Dhaka: Local Government Institute, 1979) PP. 1-7. Bilquis Ara Alam and K.Q. Azam (Edt.) Union Parishad Manual (Dhaka: National Institute of Local Government, 1987) PP. 1-2 .

৭। মুহঃ ফজলুর রহমান, শৃংখলিত ইউনিয়ন পরিষদ,(ঢাকাঃ অপ্রকাশিত)।

৮। ডঃ কামাল সিদ্দিকী এবং সৈয়দ নুরুজ্জামান (সম্মাদিত), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, (ঢাকাঃ)ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৬)।

9. Please see Sri Urobando quoted in Ahmed Shafiqul Huque Colonial Administration and Centralization: History of Local Government in Bangladesh. Dhaka; Journal of Local Government, Vol. 4 No: 1 January-June, 1985, p. 19. R.K. Mukherjee qujoted in Lutful Huq Chowdhury. Local Self- Government and Its Reorganiaztion in Bangladesh. Dhaka; National Institute of Local Government, 1987 P. 6. Sidney Webb and John Mattaz in Village Government in British India. Delhi: Neeray Publishing house, 1983, PP IX, 18. S. Bhatnagar, Rural Local Government n India. New Delhi; light

and life Publishers, n.d. P. 22, National Institute of public Administration (NIPA), Bengal District Administration Committe Report 1913- 15 Reprint Series No.4.P.91

10. For detailed discussion regarding government at the village level during pre-British period please see:John Matthai, op. cit. , S. Bhatnagar, op. cit, Lutful Huq chowdhury, op. cit, pp-5-7, Ahmed Shafiqul Huque, op. cit. Dr-A. H. M. Aminur Rahman, " Rural Local Government in Bangladesh in Historical perspectives" in Local Government Quarterly, op. cit. pp.32-33. Roushan Ara Begum, "Local Government in Ancient and Medieval Bengal" in Kamal Siddiqui (Edt), Local Government in Bangladesh , op cit.Q. Md. Afsar Hossain Saqui, Village Communities in India" in Local Government Qurterly. Vol. 5 No. 2 1976 pp. 38- 77, NIPA, op. cit.

11. Hugh Tinker. Foundation of Local Self- Government in India, Pakistan and Burma, London; (Athehen press, 1954) p.40.

১২। ১৮৮৫ সালের আইনে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধত্ব মূলক নীতি গৃহীত হয়।

13. Local Self-Government Act of 1885, Qouted in Ali Ahmed, op. cit.

14. Ahmed shafiqul Huque. op. cit. p. 19.

15. Aminur Rahman op. cit. p.41.

16. Please see for detail discussion, Kamal Siddiqui (Edt). Local Government in Bangladesh (Dhaka; National Institute of Local Government 1984) p. 37-8. Ali Ahmed, Administration of Local self- Government for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka; Local. Governent Institute, 1979) p.106-8.

17. দেখুন Aminur Rahman op. cit. p. 43.

18. Union Agricultural Assistant কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

১৯। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ৭, ১৯৭২ এবং আদেশ নং- ২২, ২২ শে মার্চ, ১৯৭৩।

20. Lutful Huq Chowdhury op. cit. p-27.

21. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Muhammad Mukabber, Local Resource Mobilization; A case study of selected upazila and union Parishads. Dhaka: NILG (Mimio) 1988.

22. The Local Government Amendment Ordinance, 1980 Ministry of LGRD and Co-operatives.

23. Swanirvar Gram Sarker (Constitution and Administration) Rules, The Bangladesh Gazettee Extra Ordinance, May 24, 1980.

24. Q. Md. Afsar Hossain Saqui, Swanirvar Gram Sarkar at work: A Case Study of Four Vilage under Savar Thana. Dhaka; NILG, 1982 (Mimio) p.41.

25. Ali Ahmed, op. cit. pp. 18-19.

26. Lutful Huq Chowdhury, op. cit. p. 16.

২৭। উপজেলার অর্ন্তগত সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য। উপজেলা পর্যায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তারা হচ্ছেন এর অফিসিয়াল সদস্য। এছাড়া, প্রতি উপজেলা হতে ৩ জন মহিলা এবং একজন পুরুষ সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য।

28. Mohammad Faizullah, Development of Local Government in Bangladesh Dhadka; NILG, 1987 pp. 102-8.

২৯। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন বরাদ্দকৃত সহায়তা মঞ্জুরী হতে সরকার ৭·৫% অর্থ সকল ইউনিয়নের মধ্যে জনসংখ্যা ও আয়তনের নিরীখে বরাদ্দ এবং সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে প্রদান করবে। অবশিষ্ট মঞ্জুরী সহায়তার অর্থ সরকার উপজেলার মধ্যে জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা ও কর্ম তৎপরতার নিরীখে উজেলা পরিষদ সমূহের মধ্যে বন্টন করবে। উপজেলা পরিষদ সমূহ নিম্নে উল্লেখিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাতওয়ারী উক্ত মঞ্জুরী সহায়তার অর্থ ব্যয় করবে।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী সংশোধিত (১৯৮৮) খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি

খাত		বরাদ্দ	
		উন্নয়ন জমার নিম্নতম অংশ	উন্নয়ন জমার সর্বোচ্চ অংশ
(ক)	কৃষি ও সেচ	১২%	২০%
(খ)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পঃ বস্তুগত অবকাঠামো বস্তুগত অবকাঠামো	৫%	১০%
(গ)	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫%	২৫%
(ঘ)	গৃহনির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা আর্থসামাজিক অবকাঠামো	১০%	১৭·৫%
(ঙ)	শিক্ষার উন্নয়ন আর্থসামাজিক অবকাঠামোঃ	৫%	১২·৫%
(চ)	শিশুদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৭·৫%	১৫%
(ছ)	স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	৫·৫%	১২·৫%
(জ)	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২·৫%	৭·৫%
(ঝ)	বিবিধ কার্যাবলী	২·৫%	৫%

সূত্রঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বারাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয়, জুন, ১৯৮৮ (সংশোধিত) পৃষ্ঠা ৪–৫ এবং ধারা ৯, পৃষ্ঠা ৮।

30. The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganisation) Ordinance, 1982.

৩১। মোঃ বদিউজ্জামান, বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ একটি সমীক্ষা (প্রশাসন সমীক্ষা, বিপিএটিসি, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা কার্তিক, ১৩৯৬) পৃঃ ৩৫–৩৬।

৩২। মোঃ বদিউজ্জমান, op. cit., পৃঃ ৩৬।

33. Ali Ahmed op. cit.p. 19 ,The rate of loss to be imposed was one- half anna on every rupee of the annual value of all lands in the district.

34. Ali Ahmed op. cit p. 3&4.

35. Ministry of Law and Parliamentary affairs, the local government ordinance, 1976, p. 5.

৩৬। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জুলাই, ১২, পৃষ্ঠা ৪০১৩–৪।

৩৭। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ ধারা ৩ (২) ,পৃষ্ঠা ৭৬৬৬।

৩৮। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর ৫ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার ৬১ জন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ৪ঠা জুন, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৭৬৬৬ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং এস, আই, ও, আইন, – ২৫১ আইন/ শা–৭জেপ– ৩০/৮৮/ ৩৭১ তারিখ ৮–৮–১৯৮৮। রাঙ্গামাটি, বান্দরবন খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়নি।

৩৯। ইবিড ধারা ৪(৫) এবং ৫(২) ,পৃষ্ঠা ৭৬৬৬।

৪০। ইবিড ধারা ১১ ,পৃষ্ঠা ৭৬৬৮।

৪১। ইবিড ধারা ১২, ১৩, ১৪, পৃষ্ঠা ৭৬৬৮ এবং প্রথম তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৩–৮৬।

৪২। ইবিড, ধারা ৪৯ ও ৫০, পৃষ্ঠা ৭৬৭৭ এবং ধারা ৫৮, পৃষ্ঠা ৭৬৭৯, তৃতীয় তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৮–৯১।

৪৩। ইবিড, ধারা ২৫, পৃষ্ঠা ৭৬৭৯।

৪৪। ইবিড, ধারা ৪৩, পৃষ্ঠা ৭৬৭৪, দ্বিতীয় তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৬৮৭।

৪৫। ইবিড, ধারা ২৬ (২) ,পৃষ্ঠা ৭৬৭২ এবং ধারা ২৭ পৃষ্ঠা ৭৬৭২।

৪৬। ইবিড, ধারা ২৮, পৃষ্ঠা ৭৬৭২–৩।

৪৭। ইবিড, ধারা ২৬(১), পৃষ্ঠা ৭৬৭১, ধারা ২৯ ও ৩০ ,পৃষ্ঠা ৭৬৭৩।

৪৮। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার , মার্চ, ১৯৮৯, ৬ মার্চ, ১৯৮৯।

49. Q. Md. Afsar Hossain Saqui "Jamshed Ahemed, Rural Local Government in Bangladesh " the journal of Local Government, Vol. 17, No.2, (Dhaka: NILG, 1988) P/115.

গ্রন্থ পঞ্জিঃ

১। ডঃ কামাল সিদ্দিকী ও সৈয়দ নুরুজ্জামান (সম্পাদিত), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল–(ঢাকা,ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৬)।

2. Montugu Harris, comparative Local Government, (London: Hutchin son's University Library, 1948).

3. Dvane, Lockward. "Local Government" in Encyclopelia of Social Sciances (New York: Ma cmillan-Free Press, 1967).
4. Hugh Tinker, Foundation of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma (London: Athcenon press, 1954)
৫। বিলকিস আরা আলম ও কে, কিউ, আজম (সম্পাদিত), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল (ঢাকাঃ ন্যাশনাল ইউষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৬)।
6. Dr. Ali Ahmed. Administration of Local Self Govenment for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka : Local Government Institute, 1979).
7. Chowdhury, Lutful Huq, Local Self Government and its Reorganisation in Bangladesh. (Dhaka: National Institute of Local Government, 1987).
8. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Mohammad Mukabber, Local Resource Mobilization: A Case study of selected Upazila and Union Parishads. (Dhaka: NILG, Mimeo, 1988).
9. Q. Md. Afsar Hossain Saqui and Jamshed Ahmed. Rural Local Government in Bangladesh. The Journal of Local Government, Vol. 17, No: 2. (Dhaka: NILG, 1988).
10. মোঃ বদিউজ্জামান, বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ একটি সমীক্ষা (প্রশাসন সমীক্ষা, বিপিত্রটিসি ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৬)
11. The Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983.
12. The Local Government (Upazila Praishad and Upazila Administration Re-Organization) Ordinance , 1982.
13. Ministry of Local Government Rual Developement and Co-operatives, The Local Government Amendment Ordinance, 1980.
১৪। স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮।
১৫। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকারী পরিষদ আইন, ১৯৮৯।
১৬। বান্দারবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।
১৭। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯।

নারী জাগরণ ও বাংলাদেশের প্রশাসনে নারীদের ভূমিকা

আয়েশা আজিম

১.০ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশ এখনও চরম ক্ষুধা, বস্ত্রের অভাব, গৃহহীনতা, অপুষ্টি ও নিরক্ষরতার মত মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত। এখনও এসব সমস্যা সমাধানে আমরা অক্ষম রয়েছি। আমাদের জীবনের আশা, স্বপ্ন ও সুন্দর সম্ভাবনার জন্য উল্লিখিত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান ও সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ও উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজন। 'উন্নয়ন' বলতে এখানে আমরা একাধারে সমাজের ধনী, দরিদ্র, নারী ও পুরুষ উভয়ের উপকারে আসার উন্নয়নের কথাই বলছি। কেননা উন্নয়নের সংজ্ঞা, যথা-"বস্তুগত সভ্যতার ভিত্তিতে জীবনের উৎকর্ষ সাধন" অর্থে আমরা ধরে নেব সমাজের নারী-পুরুষের ভেদাভেদ থাকা সত্বেও এর সুফল উভয়ে সমানভাবে পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান পুরুষের চাইতে কম শক্তিশালী সেহেতু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন এখনও রয়েছে এ সমাজের পুরুষের পক্ষে।

১.১ সুতরাং এদেশের সত্যিকারের উন্নয়ন হতে হলে নারী সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে বা করছে তার সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। যদিও আমরা বলে থাকি 'উন্নয়ন শ্রেণী নিরপেক্ষ' কিন্তু কার্যতঃ তা নয়। এদেশের নারীরা সব ব্যাপারে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাদের উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ করে পুরুষেরা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেও নারী আন্দোলন এখনও পর্যন্ত বিতর্কিত । ঐসব দেশের নারী আন্দোলনসমূহ উন্নয়ন দর্শনে এখনও তেমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। সত্যিকার অর্থে নারীদের মানবাধিকার এখনও পরিপূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি।

১.২ সভ্যতার আদিযুগ অর্থাৎ শিকার যুগ হতে প্রথম পর্যায়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। জীবন ধারণে প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার। উৎপাদন ব্যবস্থায় উভয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতো। পুরুষের চেয়ে নারী কোন কর্মে পিছিয়ে ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত হয়েও নারীকে আরও দায়িত্ব পালন করতে হত। যথাঃ সন্তান ধারণ এবং সন্তান পালন। প্রকৃতিগতভাবে এদুটো কাজ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে নারীরা পুরুষের চাইতে পিছিয়ে পড়ে এবং এদু'টি কাজ এক সংগে করতে গিয়ে নারীরা তাদের সামাজিক জীবনের অবস্থান সংকীর্ণ করে ফেলে। স্বভাবতভাবে, জীবন চলার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, জীবন ধারণের জন্য এবং প্রয়োজনীয় আহার্যের জন্য নারীকে হাত পাততে হল পুরুষের কাছে। নারী হয়ে যায় পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সে সময় হতে নারীকে বিশেষ করে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্নভাবে নারীরা পুরুষের হাতে বন্দী হতে থাকে। পুরুষ জাতি এভাবে ধীরে ধীরে নারীদের মানব সত্বার অধিকার কেড়ে নেয়। নারীদের জন্য এমনকি প্রণয়ন করে নতুন নতুন আইন। তারা কখনো প্রয়োগ করেছে ধর্মীয় অনুশাসন, কখনও সামাজিক অনুশাসন এবং কখনও পারিবারিক অনুশাসন। এ ধরনের অনুশাসনগুলোর সাথে ভ্রান্ত ধারণা, এক পেশে শিক্ষা, বিভিন্ন কুসংস্কার ইত্যাদি দিয়ে নারীদের প্রায় অন্ধ করে রাখে। নারীকে ধর্মে–বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মে যে স্থান দিয়েছে তার সত্যিকারের প্রচার বা প্রয়োগ পুরুষ কখনও করেনি। বরঞ্চ নেতিবাচক ধারণাগুলোকে ফলাও করে দেখিয়েছে শুধু। সুতারাং এ ধরনের ভুল ধারণা নিয়ে মানসিকভাবে নারী জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, পুরুষের ইচ্ছামত পুরুষের ক্রীড়ার পাত্র হিসাবে বেঁচে থাকে। এভাবে তাদের আত্মোপলব্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, হাজারো বছর ধরে।

২.০. আমাদের এই উপ–মহাদেশের নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সত্যিকার উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি কোন দিন তাদের জীবনে আসেনি। অশিক্ষা, বিভিন্ন ঐতিহ্য ও কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থাকল তারা হাজার বছর ধরে। এই উপ–মহাদেশের নারী জাতির এরূপ পিছিয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে তেলেগু'র ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক গোঁপি চাঁদ তাঁর উপন্যাস 'দি লাইফ অব ইনকমপিটেন্ট পারসন'–এ লিখেছেন যে এই উপ–মহাদেশের নারী জাতির জীবনটা যেন এক অনুপযুক্ত লোকের মত। তাদের সব কিছুতেই বাধা, সব সময় নমনীয় ও নীরব দর্শকের মত তাদের মৌন থাকতে হয়। কারও উপর রাগ করা তাদের শোভা পায় না সেটা কৃষ্টি বিরুদ্ধ। কারো মনে কষ্ট দেয়া, বিশেষ করে আত্মীয়–স্বজনের মনে যাতে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। এ সব কারণে মহিলারা সব সময় হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন। একজন মানুষের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তার নিজস্ব উন্নয়ন হয়। স্বাধীনতা এ সুযোগটি এনে দেয়। কিন্তু এই ধরনের স্বাধীনতা হতে এ দেশের মহিলারা সর্বদা বঞ্চিত রয়েছে। আমাদের উপ–মহাদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমাদের মহিলাদের

জীবন গড়ে উঠেছে অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব্যক্তির ন্যায়। বেশীর ভাগ নারী তাদের নিজের জীবনের কোন কাজে লাগে না, অপরের কোন কাজেও আসে না।

২.১. মহিলাদের এ ধরনের পিছিয়ে থাকার সম্ভবতঃ তিনটি কারণ ধরা যেতে পারে। প্রথমতঃ শিশুকাল হতে মহিলাদেরকে পুরুষের প্রাধান্যের ধারণাকে মেনে নিয়ে, পিছিয়ে পড়ার মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে হয়– যেটাকে প্রখ্যাত লেখিকা ভি, কে, রেনডল পলদেন "শিশুকালীন সামাজিকতার প্রভাব" (বা এফেক্ট অব চাইল্ডহুড সোস্যালাইজেশন) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া মাতৃত্ববোধ, সন্তান লালন, ঘর পরিচর্যা এইসব করতে গিয়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় অগ্রগতিতে নিজেদের পিছিয়ে রেখেছে। তৃতীয়তঃ সমাজের বা পরিবারের ক্ষমতা বিন্যাসে মহিলাদের অবস্থানগত দুর্বলতা বা মহিলাদের নিজস্ব সাংগঠনিক অক্ষমতা। এর কারণ নারী সমাজ এত যুগ পর্যন্ত কোন রকম ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে পারেনি।

২.২. ইতিহাসের দিকে তাকালে এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। নারীরা যুগে যুগে অবহেলিত ছিল। তবে একথা সুস্পষ্ট যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের উপর শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনা কোন দিন শেষ কথা হয়ে থাকেনি। যুগে যুগে অত্যাচার ও শোষণ যখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তখন নারীরা বাধ্য হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, নিজেদের সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মধ্যে সচেতনতা জন্মেছে এবং তারা সনাক্ত করতে পেরেছে তাদের নিজেদের অবস্থান কোথায়। তাই আমরা দেখতে পাই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে উন্নত দেশগুলিতে নারীরাও পুরুষের সাথে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.০. পাশ্চাত্যের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় পূর্বে নারীদের তারা নিম্নশ্রেণী হিসাবে দেখত। এরিসটোট্ল লিখেছেনঃ "Female nature is affected with a natural defect." সেইন্ট টমাস বলেছেনঃ "A female is defective", সেকসপিয়ার বলেছেনঃ "Fraility thy name is woman," উল্লিখিত উক্তিসমূহের মধ্য হতে নারী জাতির প্রতি তাদের মনোভাবের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এলিস ক্লার্কের সতের শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড হতে জানা যায় যে, সে দেশের নারীরা শিল্প বিপ্লবের পূর্বেও কর্মঠ ছিল এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল অনেকদিন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলির নারীদের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। যুগ যুগ ধরে তারা শোষিত ও অবহেলিত হয়েছে।

৩.১. যাহোক বর্তমান পৃথিবীতে নারী সমাজের অগ্রগতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা মাত্র। নারী সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজে নারীদের অধিকার দেয়ার

নিমিত্তে নারীদের সমান অধিকারের দাবী আন্তর্জাতিকভাবে আসলে স্বীকৃত হয় মাত্র ১৯৩০ সাল হতে। ১৯৩৭ সালে "লীগ অব নেশন" নারীদের লিগেল স্টেটাস এর উপর চিন্তা ভাবনা শুরু করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে মহিলাদের উপর এরূপ চিন্তাভাবনা কিছুদিন স্থগিত থাকে। ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের বৈঠকে হয় ও নারীর সমান অধিকারের কথা আলোচিত হয়। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নারী সমাজের অধিকার উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যার উপর সুপারিশমালা প্রস্তুত করে।

৩.২. ১৯৪৮ সালে এলেন রুজভেল্ট, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্টের বিধবা স্ত্রী লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে, "মানব জাতির, সমাজের অথবা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার হচ্ছে-স্বাধীনতা"। তিনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে যে অসম সম্পর্ক রয়েছে তা উল্লেখ করেন। মাত্র ১৯৫২ সালে নারী সমাজের অধিকার সম্পর্কিত প্রথম আইন সম্মত প্রক্রিয়াটি প্রণীত হয়। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের মাধ্যমে মহিলারা ভোট দেবার অধিকার পায়। মাত্র ১৯৫৭ সালে নারীরা অন্য জাতির বা অন্য দেশের লোকের সাথে বিবাহ করলে নাগরিকত্ব হারাবেন না এটা সাব্যস্ত হয়। ১৯৬৫ সালে নারীদের বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিবাহে স্বতস্ফূর্ত মত নেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়।

৩.৩. এতদ্ব্যতীত উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের গুরুত্ব অব্যাহত রাখার জন্য নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়নকল্পে এবং নারী উন্নয়নে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এই ত্রিমুখী লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়। ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ" ঘোষণা করা হয়। এবং এই সম্মেলনে ১০০০ এর বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত সেমিনারে ৭০ ভাগ মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

৩.৪ . ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে ১৯৭৬ হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কালকে "নারী সমাজের সমানাধিকার উন্নয়ন ও শান্তির" লক্ষ্যে জাতিসংঘ নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। আবার ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন বিশ্বনারী সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৮০-৮৫ সময় কালের জন্য চাকুরী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি সম-অধিকার, উন্নয়ন ও শান্তি এই তিনটি লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেয়া হয়।

৩.৫. ১৯৮১ সালে নারী সমাজের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্তে কনভেনশন সংগঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বিশ্বনারী সম্মেলনে, নারী দর্শকের মুল্যায়ন এবং তা পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সম্মেলনের উপর বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট লেখা হয়। এরূপ একটি রিপোর্ট হতে জানা যায় যে নারীরা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও তারা বিশ্বের আয়ের মাত্র এক দশমাংশ এবং সম্পত্তির মাত্র এক শতাংশের অধিকারিনী।

উল্লিখিত তথ্য হতে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নারী সমাজের প্রতিকূলে বিভিন্ন বিরাজমান বৈষম্যসমূহের আন্তর্জাতিক চিত্র জানতে পারা যায়।

৪.০. এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মহিলাদের উন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থান বিশদভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশের মহিলারা যুগ যুগ ধরে শাসিত ও শোষিত হয়েছে। সেটা নারী পুরুষের শারীরিক ভিন্নতার দোহাই দিয়ে হোক, অর্থনৈতিক কারণে বা ধর্মের দোহাইয়ে হোক–পুরুষ হওয়ার কারণে নারীর উপর প্রভুত্ব করার অধিকার এদেশের পুরুষ সমাজ পেয়েছে। এদেশের পুরুষ শাসিত সমাজ ধর্মীয় অনুশাসনেরও অপব্যবহার করেছে। এছাড়া আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ইতিহাস, ধর্ম, মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনে দেখা যায় নারীর স্থান রয়েছে সব সময় নেপথ্যে।

৪.১. বাংলাদেশের মহিলাদের জাগরণের জন্য তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন বাংলাদেশের মহিয়সী নারী "বেগম রোকেয়া"। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে জাগরণ আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি পুরুষের জিঞ্জির হতে নারী মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই প্রজ্ঞাশীল মহিলা বুঝেছিলেন পুরুষের সম মর্যাদায় এদেশের নারী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

৪.২. বস্তুতঃপক্ষে নারী পুরুষ উভয়ের বহুবিধ উৎপাদন মুখী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকাই একটি জাতিকে শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। একমাত্র উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে জাতির মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোযায়।

৪.৩. যখনই পুরুষের পরিশ্রমের সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে নারীদের পরিশ্রমকে অর্থকরী উপার্জন হিসাবে ধরা হয় তখনই সংসার, পরিবার ও সমাজে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মনোভাব পরিবর্তনও বিশেষভাবে জড়িত। অর্থাৎ মহিলা জনসংখ্যা যখনই জনশক্তিতে পরিণত হয় তখনই একটি দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন আসে এবং এভাবে সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়।

৪.৪. ১৯৪৭ সালে ভারত উপ–মহাদেশে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ তদানীন্তন পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে সময় (পাকিস্তান আমলে)মহিলাদের সামাজিক স্থান ও অধিকার পুরুষের সমমর্যাদায় ছিল না। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জনসাধারণের সম–অধিকারের কথার উল্লেখ সত্ত্বেও তা কার্য্যত সম্ভব হয়নি।

৫.১. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার ফলে এদেশের নারীদের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এদেশের নারীদের উপর অনেক নির্যাতন হয়। অনেকে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজন হারায়। বিপর্য্যস্ত আর্থ–সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে শতাব্দীর বাঁধন খুলে যায় এবং তাদের জীবনে আসে পরিবর্তন। তারা পরিবারের নূন্যতম চাহিদা মেটানোর জন্য ধীরে ধীরে বাইরের জগতে এগিয়ে এসে খাপ খাওয়াতে শুরু করে।

৫.২. এভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কিভাবে পুরুষ ও নারীদের উন্নয়ন করতে হবে তার উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের নিমিত্তে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং নারী জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য সরকার তৎপর হন। ফলে ১৯৭৬ সালে মহিলাদের জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকারী সংস্থায় ১০% কর্মকর্তা এবং ১৫% ভাগ কর্মচারীর পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।

৫.৩. এখানে আরও উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলা সংক্রান্ত অংশে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য, যথাঃ– (১) মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, (২) তাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, (৩) অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ দান এবং (৪) মহিলাদের সর্বাংগীন উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে মহিলা সংগঠন ও সমাজের ছিন্নমূল মহিলাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির সুযোগ করে দেয়া হয়। বর্তমান মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট প্রায় ৪৫৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে লক্ষাধিক মহিলা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাপক বৃদ্ধি হবে বলে আশা করা যায়।

৬.০. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ–দেশে জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ নারী জাতির উন্নয়নের এবং পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের একটি শুভ ও উজ্জ্বল দিক। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা হয়। জন বহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সুপরিচিত। অবশ্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা এখনও অনেক অনগ্রসর। বাংলাদেশে বর্তমানে স্রোতের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ শিক্ষা ও উন্নয়নে স্থবিরতা এবং ভূমিহীন ও বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৬.১. স্বাধীনতার পর পর সিভিল সার্ভিস সংস্কার করার নিমিত্তে সংবিধানে ১৩৬ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ সিভল সার্ভিসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। সেহেতু আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালে দু'টি রিফর্ম কমিটি তৈরী করা হয়, যথাঃ- (১) প্রশাসনিক কর্মের পুনর্বিন্যাস (এ্যাডমিনিষ্ট্রেভি সার্ভিস রিঅরগানাইজেসন -এ,এস, আর, সি,) এবং (২) জাতীয় বেতন কমিশন (এনসিসি)। উক্ত কমিশনদ্বয় তাদের রিপোর্ট ১৯৭৩ সালে জমা দেয়। এ, স, আর, সি, ১০টি গ্রেডের পদের সুপারিশ করে এবং জাতীয় বেতন কমিশন উল্লেখিত ১০টি গ্রেডের সুপারিশ দেন। ১৯৭৬ সালে সরকার রশিদ কমিশন নামে আর একটি কমিশন গঠন করে। ১৯৭৭ সালে এই কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় এবং ১৯৮০ সালে সরকার ২৮টি ক্যাডারের সিভিল সার্ভিসের ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালে আরও দু'টি ক্যাডারের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উচ্চ পর্যায়ের আরো একটি ক্যাডার রয়েছে যা সিনিয়র পুল * নামে পরিচিত। এই পুলে সব ক্যাডারের অফিসারদের প্রবেশেরসমানপ্রবেশাধিকাররয়েছে।

৬.২. মূলতঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-ব্রিটিশ, ভারত ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বিবর্তনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। ভারত উপ-মহাদেশে বৃটিশ আমলে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির কোন সুযোগ ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যদিও জনসাধারণের সমান অধিকার উল্লেখ ছিল কিন্তু কার্যত তা দেখা যায় না। পাকিস্তান সময়ে নারীদের সাভিল সার্ভিসে নিযুক্তি বর্তমান বাংলাদেশের তুলনায় নিরপেক্ষভাবে হয়নি। কেবলমাত্র গুটিকতক সার্ভিসে যথাঃ অডিট এণ্ড একাউন্ট সার্ভিস, আয়কর সার্ভিস এবং পোষ্টাল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হত। মহিলারা সমগ্র পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। মেধা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অন্য কোন সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হতো না। এতদ্ব্যতীত মহিলাদের কর্মরত অবস্থায় বিবাহ বা পুনঃবিবাহের অনুমতি ছিল না। বিবাহ বা পুনঃবিবাহ হলে তাদের কর্মক্ষেত্র হতে পদত্যাগ করতে হত। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে মহিলারা বিবাহের পর যোগ্যতার সাথে কাজ করতে অক্ষম।

৬.৩. এতে প্রমাণিত হয় যে, ১৯৪৭ সালের স্বাধীন (পাক আমলে) নাগরিক হয়ে মেধা থাকা সত্ত্বেও সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্তি মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছিল না ছিল প্রাদেশিক পর্যায়ের। সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আমলাতন্ত্র পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান একটি নির্দিষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাই স্বাধীন বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মজীবনে বিরাট চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৯,৪৮৬ এবং তন্মধ্যে ক্যাডারভূক্ত মহিলাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৯৩৫ অর্থাৎ শতকরা

* (বর্তমানে এই ক্যাডারের বিলুপ্তি হয়েছে)।

প্রায় ১০% (১৯৮৭ সালের তথ্যানুযায়ী)। ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলারা তাদের কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সর্বক্ষণ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করছেন। সম্প্রতি একটি গবেষণায় (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা) দেখা গেছে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মহিলারা অতি দক্ষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। উল্লেখিত গবেষণায় দ্রষ্টব্য যে, মহিলারা প্রশাসনিক, বিচারকার্য নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, প্রকল্প পরিচালনা, পরিদর্শন–প্রভৃতি কাজে পুরুষের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হচ্ছে। নিম্নের সারণী হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ–

সারনী নং–১

উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার কর্তব্যে সমকক্ষতার তুলনা

পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার তুলনা সম্পর্কিত	উত্তরদানকারী উর্ধতন কর্মকর্তার সংখ্যা	শতকরা হার
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ	৩৭	৩৭%
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার মোটামুটি সমকক্ষ	৪২	৪২%
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ নয়	১৯	১৯%
নিরুত্তর	০২	০২%
	১০০	১০০%

৬.১. উল্লিখিত সারণীর ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, মনোভাব যাচাই করা হয়েছে এমন ১০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে শতকরা ৪২+৩৭ অর্থাৎ সর্বমোট ৭৯ ভাগ উর্ধতন কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তাদেরকে পুরুষ কর্মকর্তাদের সমকক্ষ ও মোটামুটি সমকক্ষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মাত্র ১৯জন কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তাদের পুরুষের সমকক্ষ বলে মনে করেন না। এক্ষেত্রে গর্বের সাথে বলা যায় যে, বর্তমানে যে সমস্ত মহিলা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগই কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হচ্ছেন। তবে মহিলা কর্মকর্তা সম্পর্কে জনগণ এখনও সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান নন। এর জন্য প্রয়োজন আরো ধৈর্য্য ও সময়ের। যাহোক বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ করে প্রশাসনিক কাজে মহিলাদের অবদান জাতির উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই অবস্থার আরও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ

১। মানবাধিকারঃ পঞ্চাশটি প্রশ্ন ও উত্তর,মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৪০তম বার্ষিকী, ১৯৮৪–১৯৮৮, জাতিসংঘ, ঢাকা, ১৯৮৭।

২। হনম, আখতার খালিদা, " হেলথ এণ্ড পপুলেশন প্লানিং", জাতীয় বার্ষিক সম্মেলন, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৯।

৩। ইসলাম, সামিমা ও বেগম জাগিরা, "ভিকটিমস অব ভায়োলেন্স", ঢাকা, দি এশিয়ান ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৫।

৪। হক, এ, কে, এম, এবং বালা, হিরালাল "সিভিল সার্ভিসে মহিলা", বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৮৭।

5. Charlton Sue Elan M, Women in Third World Develpment.

6. Ahmed Syed Giasuddin, "Administrative Structure in Bangladesh: a Brief Narration of Its Historical Antecendents and Modern Process., ' "Dhaka, Dhaka University, 1987.

7. Begum Rowshanara and Islam Shamima, (EDS) Mid-decade World Conference on Women: Bangladesh Perspective, Dhaka, UNICEF, 198

উন্নয়নের সূচক

নাসিরউদ্দিন আহমেদ

ভূমিকা

১.০. দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে নীতি নির্ধারণ জনিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়টির উদ্ভব হয়। ঐ সময় বেশ কিছু উপনিবেশ (যথা– ভারতবর্ষ) স্বাধীনতা লাভ করে। এসময় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন এ ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন মতবাদগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে ধরা হতো।'চুঁইয়ে পড়া অর্থনেতিক উন্নয়ন তত্ত্ব' (trickle down thesis) নামে অভিহিত এসব তত্ত্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অনুকূলে উৎপাদন বিতরণের প্রসঙ্গটি একেবারে উপক্ষো করে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। অনুমান করা হয়েছিল যে প্রবৃদ্ধির সুফল জনসাধারণের কাছে চুঁইয়ে পড়বে। মাথাপিছু জিএনপি সূচকের সাহায্যে দেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন পরিমাপের প্রয়াস নেয়া হয়। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একদিকে যেমন দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা অর্থাৎ অনপেক্ষ দারিদ্র্য (absolute poverty) বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে ধনী হচ্ছে অধিক ধনী, আর দরিদ্র হচ্ছে দরিদ্রতর–অর্থাৎ আপেক্ষিক দারিদ্র্য (relative poverty) বেড়ে যাচ্ছে।

১.২· উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের দশকে বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মৌলিক চাহিদা পূরণ' (Basic Needs Fulfilment) সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। পল ষ্টীটিন, জেমস গ্রান্ট, মাহবুব –উল–হক প্রমুখ এ তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁদের মতে, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই মৌলিক চাহিদা পূরণ

মতবাদের সাথে সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক হিসেবে উদ্ভাবিত হলো (Physical Quality of Life Index -PQLI) সম্প্রতি ইউএনডিপির উদ্যোগে প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদার সংমিশ্রণে (Human Development Index'-HDI) নামক সূচকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য নিবন্ধে বর্ণিত প্রধান তিনটি সূচকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধটি কতিপয় পুস্তক ও প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে।

মাথাপিছু জিএনপি ঃ

২.১· মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সনাতনী এবং সর্বাধিক দ্রুত, ও ব্যবহৃত সূচক। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যে সব চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়িত করে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) পাওয়া যায়। মাথাপিছু জিএনপি নিম্নোক্ত ভাবে বের করা হয়ঃ–

$$\text{মাথাপিছু জিএনপি (আর্থিক)} = \frac{\text{জিএনপি}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

আর্থিক জিএনপিকে মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত জি এনপি পাওয়া যায় অর্থাৎ

$$\text{প্রকৃত জিএনপি} = \frac{\text{আর্থিক–জিএনপি}}{\text{জিএনপি–Deflator}}$$

২.২. জিএনপি Deflator হলো একটি আপেক্ষিক সূচক যা যে কোন বছরের জিএনপিকে ভিত্তি বছরের (Base year) দামে প্রকাশ করে। মাথাপিছু আর্থিক জিএনপির চেয়ে মাথাপিছু প্রকৃত জিএনপি উন্নততর সূচক। কারণ শেষোক্তটিতে মুদ্রাসংকোচন বা মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করা হয়। ফলে প্রকৃত উৎপাদনের (Real Output) একটি নির্ভেজাল ও অর্থবহ পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

২.৩. যদিও মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সর্বাধিক ব্যবহৃত, তবুও এটি প্রধানতঃ নিম্নবর্ণিত সমস্যায় জর্জরিতঃ

ক) উৎপাদনে গৃহবধুদের এবং স্বকৃত অন্যান্য অবদান গণনা করা হয় না।

(খ) অ–মুদ্রায়িত আত্ম পোষণ খাতের কার্যাবলী ধরা হয় না।

(গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বাহ্য প্রভাব (Externalities) জিএনপি পরিমাপে আসে না।

(ঘ) সমান্তরাল অর্থনীতি অর্থাৎ কালো টাকার লেনদেন জিএনপি পরিমাপের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় না।

(ঙ) এই সূচকটি আয় বন্টন সম্পর্কে কিছু বলে না। তাই এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচক, উন্নয়নের নয়।

২.৪. এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা যে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় তাকে Loreng Curve বলে। এ রেখাটি লরেঞ্জ ১৯০৫ সালে উদ্ভাবন করেন। নীচের চিত্রে Lorenz Curve দেখানো হলোঃ-

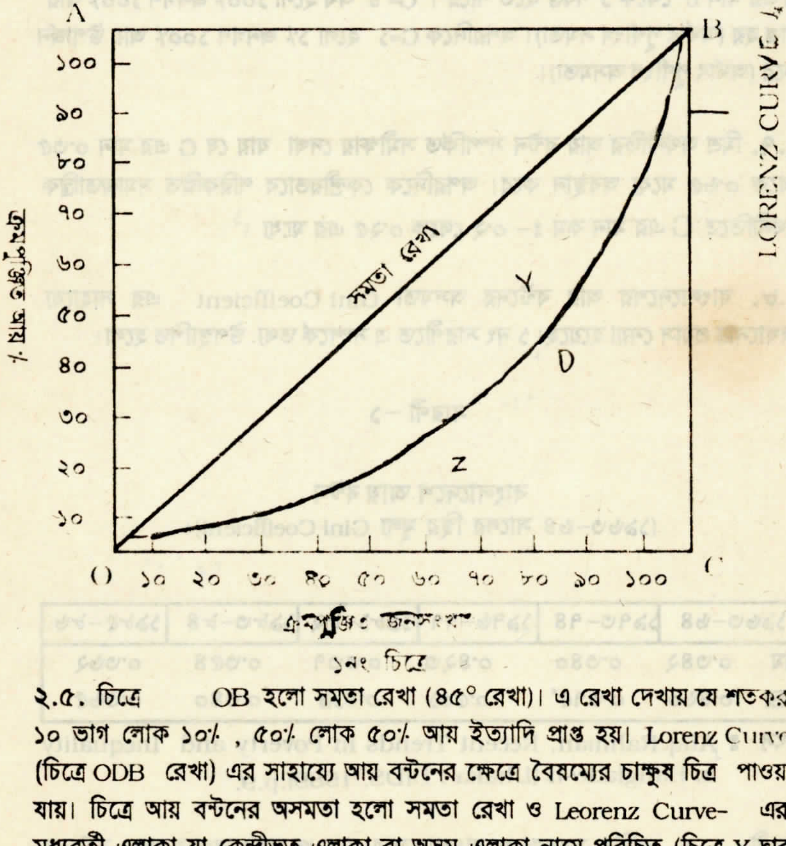

১নং চিত্র

২.৫. চিত্রে OB হলো সমতা রেখা (৪৫° রেখা)। এ রেখা দেখায় যে শতকরা ১০ ভাগ লোক ১০% , ৫০% লোক ৫০% আয় ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। Lorenz Curve (চিত্রে ODB রেখা) এর সাহায্যে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের চাক্ষুষ চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রে আয় বন্টনের অসমতা হলো সমতা রেখা ও Leorenz Curve- এর মধ্যবর্তী এলাকা যা কেন্দ্রীভূত এলাকা বা অসম এলাকা নামে পরিচিত (চিত্রে Y দ্বারা দেখানো হয়েছে)।

২.৬. একটি অর্থনীতিতে আয় বন্টনের অসমতার ব্যপ্তি Lorenz Curve এর সাহায্যে বুঝা যায় না। তাই আয় বন্টনে অসমতা পরিমাপের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিমাপক হলো Gini Coefficient (G) বা Concentration Ratio. ১৯১৪ সালে ইতালীর পরিসংখ্যানবিদ জিনি এ সহগ কটির উদ্ভাবন করেন। সমতা রেখা

ও Lorenz Curve এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে (চিত্রে Y) সমতা রেখার নীচে অবস্থিত মোট অঞ্চল (চিত্রে (Y + Z) দিয়ে বিভাজন করলে G পাওয়া যায় অর্থাৎ

$$G = \frac{Y}{Y+Z}$$

G এর মান ০ থেকে ১ পর্যন্ত হতে পারে। G= ০ অর্থ হলো ১০০% জনগণ ১০০% আয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ণাংগ সমতা)। অপরদিকে G=১ হলো ১% জনগণ ১০০% আয় উপার্জন করে (অর্থাৎ পূর্ণাংগ অসমতা)।

২.৭. মিশ্র অর্থনীতির আয় বন্টন সম্পর্কিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে G এর মান ০·৩৫ থেকে ০·৬৫ মধ্যে অবস্থান করে। অপরদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে G এর মান কম ঃ- ০·২ থেকে ০·২৫ এর মধ্যে ।[১]

২.৮. বাংলাদেশের আয় বন্টনের অসমতা Gini Coefficient এর সাহায্যে দেখানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ১ নং সারণীতে এ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হলো।

সারণী –১

বাংলাদেশে আয় বন্টন

(১৯৬৩–৬৪ সালের স্থির মূল্য Gini Coefficient)।

	১৯৬৩–৬৪	১৯৭৩–৭৪	১৯৭৬–৭৭	১৯৮১–৮২	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৫–৮৬
গ্রাম	০·৩৪২	০·৩৪০	০·৪২৩	০·৩৩৭	০·৩৫৪	০·৩৬২
শহর	০·৪৬০	০·৩৭৫	০·৫০১	০·৪১৯	০·৩৪০	০·৩৬৫

উৎস : Atiq Rahman, Recent Trends in Poverty and Inequality in Bangladesh (Dhaka : BIDS, 1989).p.9.

সারণী– ১ এ বর্ণিত সময়কালে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে আয় বন্টনের অসমতাজনিত পরিস্থিতি ওঠানামা করেছে।

২.৯. নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক– রাজনৈতিকভাবে যতদূর সম্ভব G কে O এর কাছাকাছি নামিয়ে আনা (OB রেখা) । Gini Coefficient হ্রাসের জন্য কর, ভর্তুকি, প্রত্যক্ষ আয় স্থানান্তর, সরকারী দ্রব্যাদির সুসরবরাহের ব্যবস্থা (যথা– বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, হাসপাতাল) নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

1. Tony Killick, Policy Economics (London: ELBS , 1983), p.110.

PQLI

৩.১. মাথাপিছু জিএনপি সূচকের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে Overseas Development Council (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এর উদ্যোগে অর্থনীতিবিদ মরিস ডেভিড Physical Quality of Life Index-(PQLI) নামক যৌগিক (Composite) সূচক উদ্ভাবন করেন। যে তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত হলো তা হচ্ছে ঃ- (১) এক বছর বয়সে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল, (২) শিশু মৃত্যুর হার, ও (৩) শিক্ষার হার। মরিস নিম্নলিখিত অনুমানের ভিত্তিতে উপরোক্ত সূচক তিনটি নির্বাচন করেছেনঃ- (ক) প্রায় সকল অবস্থায় মানুষ দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পছন্দ করে, (খ) মানুষ কদাচিৎ তার শিশুদের মৃত্যুর কামনা করে, এবং (গ) শিক্ষার হার কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[২] PQLI মানুষের অধিকাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলাফল পরিমাপ করে।

মাথাপিছু জিএনপি বনাম PQIL

(১) মাথাপিছু জিএনপি অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির সূচক, অপরদিকে PQLI হলো উন্নয়নের সূচক।

(২) মাথাপিছু জিএনপি উপকরণ পরিমাপ করে, অন্যদিকে PQLI উপকরণ প্রয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল পরিমাপ করে।

৪.২. মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ক'টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ১ টি উন্নত দেশ, ১ টি তেল সমৃদ্ধ দেশ ও ৪ টি উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জন্মকালে গড় আয়ুস্কাল, শিশু মৃত্যুর হার ও শিক্ষার হার সারণী -২ এ উপস্থাপিত হলো।

২· Morris, David Morris, Measuring the conditions of the world's poor, (New york: pergamon press, 1979)

সারণী –২

৬ টি দেশের জনগণের জন্মকালে গড় আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যুর হার ও শিক্ষার হার

দেশ	জন্মকালে গড় আয়ুষ্কাল (বছরে ১৯৮৮)	শিশু মৃত্যুর হার জীবিত শিশুর হারে (প্রতি হাজার ১৯৮৮)	শিক্ষার হার %
জাপান	৭৮	৫	৯৯
সৌদিআরব	৬৪	৬৯	৫০
শ্রীলংকা	৭১	২১	৮৭
পাকিস্তান	৫৫	১০৭	৩০
ভারত	৫৮	৯৭	৪৩
বাংলাদেশ	৫১	১১৮	৩৩

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯০

জাপান (১৯৮৭) এর শিক্ষার হার এবং সৌদি আরব (১৯৮৬) এর পুরুষের শিক্ষার হার দি ওয়ার্ল্ড অ্যালমানক এন্ড বুক অব ফ্যাক্টস ১৯৯০ থেকে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের শিক্ষার হার ১৯৮৫ সালের।

৪.৩. সারণী –৩ এ উক্ত ৬ টি দেশের মানুষের মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI দেয়া গেল।

উল্লেখ্য, সারণী –২ উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী –৩ এর PQLI গণনা করা হয়েছে।

সারণী –৩

মাথাপিছু জিএনপি ও PQLI এর ভিত্তিতে ৬ টি দেশের শ্রেণী বিন্যাস

দেশ	মাথাপিছু জিএনপি (১৯৮৮ সালের মার্কিন ডলারে) (১৯৮৮)	PQLI
জাপান	২১,০২০	৯৯·১০
সৌদিআরব	৬,২০০	৬০·৭৪
শ্রীলংকা	৪২০	৮৬·৩৯
পাকিস্তান	৩৫০	৩৯·৬৭
ভারত	৩৪০	৪৮·৪৯
বাংলাদেশ	১৭০	৩৪·৯৩

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯০ পৃ ঃ ১৭৮–১৭৯ PQLI লেখক কর্তৃক গণনাকৃত।

৪.৪. সারণী–৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সৌদি আরবের জনগণের মাথাপিছু জিএনপি শ্রীলংকার চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশী। অপরদিকে PQLI এর মাপকাঠিতে সৌদি আরবের PQLI শ্রীলংকার চেয়ে অনেক কম। ভারতের মানুষের মাথাপিছু জিএনপি পাকিস্তানের চেয়ে কম, অথচ PQLI এর মাপকাঠিতে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

৪.৫. PQLI মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিণামের পরিমাপক এবং এর সাহায্যে বিনিয়োগের ফলাফল পরিমাপ করা যায়। উর্ধাংকের PQLI মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পরিণামের পরিমাপক এবং এর সাহায্যে বিনিয়োগের ফলাফল পরিমাপ করা যায়। উর্ধাংকের PQLI এটাই প্রমাণ করে যে কাংখিত ফলাফল লব্ধ হচ্ছে–অর্থাৎ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে না। এক বছর বয়স্কালের একটি শিশু যে আর্থব্যবস্থায় ৬৫ বা ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচার যুক্তিগ্রাহ্য প্রত্যাশা করতে পারে, যেখানে ভূমিষ্ঠ শিশুর মৃত্যুর আশংকা নেই বললেই চলে এবং যে সমাজে প্রায় সবাই শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত সেখানে সার্বিক প্রয়াস অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এই নিরিখে PQLI কে একটি উৎকৃষ্ট উন্নয়ন সূচক হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

৪.৬. PQLI উন্নয়নের উন্নতর মাপকাঠি বলে বিবেচিত হলেও এর প্রধান সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপঃ–

(১) এটি একটি সীমিত মাপকাঠি। জীবনের উৎকর্ষতার অনেক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যথা–নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, মানব অধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করতে এটা ব্যর্থ হয়েছে।

(২) যে তিনটি সূচক নিয়ে PQLI গঠিত তার প্রত্যেকটিকে সমান গুরুত্ব (Weight) দেবার যৌক্তিকতা উল্লেখ করা হয় নি।

(৩) মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ও শিশু মৃত্যুর একই ধরনের বিষয়ের প্রতিফলন।

(৪) অর্থনৈতিক বিষয় (যথা– প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি) সম্পর্কে এ মাপকাঠিতে কোন বক্তব্য নেই।

HDI

৫.১. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এ'র পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯০–এ উন্নয়নের একটি নতুন মাপকাঠির উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হকের নির্দেশনায় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের একটি দল এই উদ্ভাবন করেছেন। প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বিত এ মাপকাঠির নাম Human Development Index,-সংক্ষেপে HDI। মানব জীবন

যাত্রার ওপর উন্নয়নের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে HDI উদ্ভাবিত হয়েছে। সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য–ব্যর্থতা এর সাহায্যে পরিমাপ করার প্রয়াস নেয়া যেতেপারে।

৫.২. 'মানব উন্নয়ন' বলতে মানুষের পছন্দ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে।[৩] HDI নিম্নলিখিত তিনটি সূচক নিয়ে গঠিতঃ– (১) মানুষের গড় আয়ুস্কাল, (২) শিক্ষার হার, এবং (৩) ক্রয় ক্ষমতা (প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি)।

৫.৩. একটি সমাজে বসবাসরত মানুসের কল্যাণ তার আয়ের মাত্রার উপর নয়, বরং তার আয় কতখানি কাজে লাগানো হলো তার উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য রিপোর্টে দেখাযায়, কোন কোন দেশ যথা–কোষ্টারিকা, শ্রীলংকা তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নহারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানব উন্নয়ন অর্থাৎ গড় আয়ুস্কাল, শিক্ষার হার ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। অপরদিকে কোন কোন দেশ যথা–ব্রাজিল, ওমান, সৌদি আরব তাদের উচ্চ আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার মানব উন্নয়নের কাজে লাগাতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৪. রিপোর্টে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডাক্তারের চেয়ে আটগুণ বেশী সৈন্য রয়েছে। এ দেশগুলোর সম্মিলিত সামরিক খাতে ব্যয় (সম্মিলিত জিএনপির ৫·৫% সম্মিলিত শিক্ষাও স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় (সম্মিলিত GNP-র ৫·৩%)–এর চেয়ে বেশী। রিপোর্টে সামরিক খাত থেকে অর্থ সরিয়ে মানব উন্নয়ন বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

৫.৫. নিঃসন্দেহে HDI উন্নয়নের সবচেয়ে ব্যাপক ও উন্নততর মাপকাঠি। তবুও এর নিম্নলিখিত দুর্বলতা রয়েছেঃ–

(১) কতিপয় দেশ যথা– কোস্টারিকা, শ্রীলংকা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় তাদের অর্জিত প্রবৃদ্ধিকে মানব উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হলো তা রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়নি।
(২) যে তিনটি উপকরণ নিয়ে HDI গঠিত তার প্রত্যেকটিকে সমান গুরুত্ব (Weight) দেবার যৌক্তিকতা বর্ণিত হয় নি।
(৩) এটি গ্রাম ও শহর এলাকার, নারী ও পুরুষের , ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে আয়ুস্কাল, শিক্ষার হার ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য আড়াল করে রাখে।
(৪) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে বিবেচনার মধ্যে আনতে এর ব্যর্থতা।

৩ UNDP, Human Development Report 1990 P.1.

উপসংহার

একটি দেশ উন্নয়নের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা পরিমাপের জন্য সূচক ব্যবহারের প্রয়োজন। সূচকের সাহায্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতির সাফল্য–ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে। তাই সূচকের মাধ্যমে কোন দেশের উন্নয়ন পরিমাপের পর সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। সনাতনী ও বহুলব্যবহৃত মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাপক। অপরদিকে PQLI মৌলিক চাহিদার পরিমাপক। তাই PQLI কে মাথাপিছু জিএনপির চেয়ে উন্নততর সূচক হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। সম্প্রতি ইউএনডিপির উদ্যোগে HDI নামক যে সূচকটি উদ্ভাবিত হয়েছে তা প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদার সমন্বিত রূপ। নিঃসন্দেহে এটি অন্য দুটো সূচকের চেয়ে উন্নত। তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে HDI কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূচকে পরিণত করা যেতে পারে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Hicks, Norman and Paul Streeten" Indicators of Development: The Search for a Basic Needs Yardstick", World Development, No.6 (June, 1979)

২. Hoffman, Mark S (edited), The World Almanac and Book of Facts 1990.

৩. Killick, Tony, Policy Economics (London: ELBS, 1983).

৪. Morris, Morris D, Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index . (New York: Pergamon Press, 1979).

৫. Rahman, Atiq, Recent Trends in Poverty and Inequality in Bangladesh (Dhaka : BIDS , 1989).

৬. Todaro, Michael P, Economic Development in the Third World (Third Edition). (Hyderabad: Orient Limited, 1987).

৭. UNDP, Human Development Report, 1990.

৮. The World Bank, World Development Report, 1990.

লোক প্রশাসন সাময়িকী দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯১ চৈত্র ১৩৯৭

জাতীয় উন্নয়নে লোকজ মাধ্যমের ব্যবহারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ডঃ মোহাম্মদ হান্নান

১.০. আজকের দিনে জাতীয় উন্নয়ন অর্থই হচ্ছে উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। আধুনিক পরিকল্পনবিদগণ এই অংশগ্রহণের অর্থ শুধুমাত্র উন্নয়ন কাজে অংশ নেওয়ার কথাই বোঝেন না, উন্নয়নের মূল পরিকল্পনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও কামনা করেন। তারা বলেন, উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেহেতু জনগণ, সেহেতু জনগণের কাছ থেকেই জানতে হবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণ ঠিক কিভাবে অংশ নিতে চায় এবং নিজেদের কি কি প্রগতিমুখী পরিবর্তন তারা কামনা করে।

১.১. জনগণের এই মনোভাবকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো এবং তার সামগ্রিক ফললাভের নিশ্চয়তা থেকে যে প্রক্রিয়ার জন্ম, তা থেকেই উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্বের জন্ম। প্লেটোর একটি সুন্দর উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত স্মতর্ব্য । তিনি বলেছেন, 'Communication is winning of men's mind' – অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার প্রক্রিয়াকেই প্লেটো 'যোগাযোগ' বলতে চেয়েছেন। আজকের দিনে উন্নয়ন যোগাযোগে এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে? কারণ যে কোনো কার্যসিদ্ধির মৌলিক কাজ হচ্ছে, মানুষের মনের মধ্যে প্রথমে বাসা বাঁধা। আর এই কাজটিতে সফল হতে পারলে– 'জনগণের দ্বারা, জনগণের এবং জনগণের জন্যে' যে উন্নয়ন, তাতে জনগণেরই পূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে।

১.২. জনগণের এই অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ম্যাকব্রাইড কমিশনের প্রতিবেদন খ্যাত-'Many

voices, one world"[১] গ্রন্থে ৮ প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপঃ–

১. সংকেত ও শব্দ মাধ্যম
২. ভাষা মাধ্যম
৩. লেখা ও পড়া মাধ্যম
৪. ডাক ও টেলিফোন মাধ্যম
৫. গোষ্ঠী ও স্থানীয় মাধ্যম
৬. উপগ্রহ মাধ্যম
৭. কম্পিউটার মাধ্যম, এবং
৮. গণমাধ্যম ব্যবস্থা।

৩৩৩ পৃষ্ঠা সংবলিত তথ্য ও গণযোগাযোগ জগতের বিখ্যাত প্রতিবেদন ম্যাকব্রাইড কমিশনের এই গ্রন্থে গণযোগাযোগের অত্যাধুনিক (উপগ্রহ, স্যাটেলাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি) মাধ্যমের কথা উল্লিখিত হলেও উন্নয়ন যোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

১.৩. বর্তমান দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহের তো বটেই, অনুন্নত, অর্ধউন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশ সমূহেরও উন্নয়ন যোগাযোগের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে লোকজ মাধ্যম। লোকজ মাধ্যম হচ্ছে সেই মাধ্যম, যা চিরায়ত, হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং যার বসতি হচ্ছে সাধারণ জনগণমনে। এই মাধ্যম অনানুষ্ঠানিক, দ্রুত আয়াসসাধ্য এবং সাধারণ মানুষের কাছকাছি। সাধারণের মন থেকেই তা উৎসারিত এবং বিরাজিত।

১.৪. আজকের দিনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়ায় ইলেকট্রোনিক্স গণমাধ্যমের পরিপূরক হিসেবে শুধু নয়, লোকজ মাধ্যম অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ায় গণযোগাযোগে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত এবং অধিক ফলদায়ক ও দ্রুত 'সহৃদয় হৃদয়সংবেদী'। বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বাংলাদশে আর্থ –সামাজিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিচয়

২.১. বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী নীচের দিক থেকে পঞ্চম–দরিদ্র দেশ হিসেবে স্বীকৃত।[২] আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দুই অধ্যাপক জাষ্ট ফাল্যান্ড ও জে, পারকিন্স বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের প্রবল নৈরাশ্যই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে রচিত গ্রন্থে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে একটি কঠিনতম সমস্যা। যদি কখনো বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবীর যে কোন দেশের উন্নয়নই

সম্ভব। তাঁরা আরো বলেছিলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই জন্যে তাঁদের যৌথ প্রকাশনার নামও তাঁরা দিয়েছিলেন, 'বাংলাদেশ দি টেষ্ট কেইস অব ডেভেলপমেন্ট'।[৩]

২.২. বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের দুই সাবেক কর্মকর্তার এই মতপ্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের বহুল কথিত–'বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ' মন্তব্য থেকেও হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই আন্তর্জাতিক অভিমতগুলি উদ্ধৃত করা হল ' উন্নয়নশীল দেশ' বলে কথিক এই দেশটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য।

২.৩. এই প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাদশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান নেওয়া যেতে পারে। এদেশর জনসংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক দশ কোটিরও বেশী। প্রতি বর্গমাইলে ১৯১৭ জন (১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী) লোকের বাস।[৪] মোট জনসংখ্যার ১৫·২% ভাগ মাত্র শহরে বাস করে, বাকী ৮৪·৮% ভাগ জনসংখ্যারই বাস গ্রামে।[৫]

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ

সংখ্যা(০০০)

মোট জনসংখ্যা	শহর	গ্রাম
৮৯,৯১২	১৪,০৮৯	৭৫,৮২৩

বাংলাদেশ ঃ জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক অবস্থা[৬]

সংখ্যা (০০০)

বছর	মোট জনসংখ্য	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
১৯৭৪	৭১,৪৭৮	৬১,০৩৯	৯,৬৭৩	৪৩৯	২১৬	১১১
১৯৮১	৮৭,১২০	৭৫,৮৭৪	১০,৫৭০	৫৩৮	২৭৫	২৫০

সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪ টি জেলা, ৯০ টি পৌরসভা ৪৬০টি উপজেলা, ২৭টি থানা, ৪৪০১টি ইউনিয়ন, ৪৫৩টি ওয়ার্ড, এবং ৬০,৩১৫টি গ্রাম রয়েছে। দেশটিতে কৃষি শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৭·৫ মিলিয়ন এবং অকৃষিজীবী শ্রমিকের সংখ্যা ১৩·১ মিলিয়ন।[৭]

বাংলাদেশ ঃ গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবীর সংখ্যা [৮]

সংখ্যা (০০,০০০)

বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৮৫–৮৬	৩০·৯	৪·৭	২৬·২

বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার ২৩·৮%।

গ্রাম ও শহরে বাংলাদেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা [৯]

১০ বছর ও তদূর্ধ (হাজারে)

এলাকা	মোট জনসংখ্যা	নিরক্ষর লোকের সংখ্যা	শতকরা হার
বাংলাদেশ	৫৮,১৬৯	৪১,৬৩৯	৭১·৬
শহর	৯,৪৯৯	৫,০৭৫	৫৩·৪
গ্রাম	৭৮,৬৭০	৬৬,৫৬৩	৪৬·৫

২.৪. উপরের উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ আর্থ–সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ একটি দেশ যার অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল, শিক্ষার হার কম,অথচ সমস্যার পাহাড় দেশের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অথর্ব করে রেখেছে। এই রকম একটি অবস্থার দেশে জাতীয় উন্নয়নে যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

৩.১. বাংলাদেশের ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের মধ্যে বেতার (রেডিও) সবচেয়ে জনপ্রিয়। অশিক্ষা ও ধর্মীয় গোড়ামীতে আকীর্ণ বাংলাদেশের সমাজে বেতারযন্ত্র তাঁর আবিষ্কারের যুগে 'যাদুর বাক্স' বলে অভিহিত ছিল এবং এই ধরনের একটি বাক্স থেকে কথা বের হতে পারে এমন বিশ্বাস আনলে ঈমান[১০] হারানোর শঙ্কা করা হতো, এবং ধর্মীয় বেত্তাদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে কড়া ফতোয়াও জারী হয়েছিল।

৩.২. বিশ্বাসের এমন একটা অবস্থা থেকে আজ বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে বেতার বাংলাদেশে সবচেয়ে সুলভ গণসম্প্রচার হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিগুণে বেতার এখন পকেট সাইজে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তুলনামুলকভাবে এই যন্ত্রটি সস্তাও। কৃষক জমিতে লাঙ্গল চষছে এবং জমির আলের কাছে বেতার যন্ত্র বাজছে– এমন চিত্র বাংলাদেশে খুব সুলভ না হলেও একেবারে অদৃশ্য নয়। বর্তমানে

সমগ্র দেশে বাংলাদেশ বেতার তার মোট ৬টি কেন্দ্র মিলে দৈনিক ৮২–৮৩ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে।

৩.৩. বিভিন্ন কার্যক্রমে এর সময় ভাগ নিম্নরূপঃ[১১]

বেতার অনুষ্ঠান	সময়	
জনসংখ্যা কার্যক্রম	দৈনিক	১৯৫ মিঃ
স্বাস্থ্য কথা	দৈনিক	৭৫ মিঃ
কৃষি কথা	দৈনিক	২৫ মিঃ
শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান	দৈনিক	২৪০ মিঃ
সৈনিকদের জন্যে অনুষ্ঠান	দৈনিক	২৪৫ মিঃ
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	দৈনিক	৫৭০ মিঃ

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের বেতার কার্যক্রমের এই সময় বিভাগ উন্নয়ন যোগাযোগে একটি প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ কৃষি দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হলেও এর জন্যে দৈনিক মাত্র ২৫ মিঃ ব্যয় করা হয়। দেশটি শিক্ষায় অনগ্রসর হলেও সপ্তাহে এর জন্যে যেখানে ২৪০ মিনিট বরাদ্দ হয়,সেখানে সৈনিকদের জন্যে বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হয় ২৪৫ মিনিট। শুধু তাই নয়, উন্নয়নশীল দেশে বেতারযন্ত্রে গণযোগযোগের মাধ্যমে, জনকল্যাণই এর যেখানে মূল লক্ষ্য, সেখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ৫৭০ মিনিট ব্যয় করা মানেই, তাকে মুনাফালাভী প্রতিষ্ঠানের মতো দেখা হচ্ছে, অথবা ব্যবহার করা হচ্ছে। এর যে সামাজিক দায়িত্ব আছে, এই ব্যবসায়িক মনোভাব তা থেকে বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে।

৩.৪. অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাঠকর্মীরা সহজেই পকেটে বেতার যন্ত্র সাথে রাখতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী উন্নয়ন 'বার্তা /'মেসেজ' জনগণের কাছে পৌছে দিতে পারে। এক সময় ছিল (ষাটের দশকের শেষ দিকে এবং সত্তর দশকের, প্রথমার্ধে) ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কৃষি কথার আসরের 'মজিদের মা ' শীর্ষক একটি চরিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং এর মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় জরুরী 'মেসেজ' সরাসরি জনগণের কাছে পৌছানো হোত। কিন্তু এরপরও মেসেজ পৌছানোর ক্ষেত্রে বোতারযন্ত্র বাংলাদশে সর্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি।

৩.৫. বেতার যন্ত্রকে দেশের মানুষের কাছে সুলভ করতে হবে। প্রতিটি হাট ও বাজারে,চৌরাস্তার মোড়ে, স্কুল ও কলেজে বাক্স করে সংরক্ষিত অবস্থায় বেতার যন্ত্র রাখা এবং জাতীয় স্থানীয় সংবাদ বুলেটিনের সময় অথবা জরুরী বার্তা অনুষ্ঠান কিংবা উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের সময় তা এক যোগে চালু করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, বেতার একটি ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যম হলেও সুলভতার কারণেই তা গ্রামের মানুষের কাছে একটি লোকজ উপাদানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। গ্রামে

এখনো বিয়ের অনুষ্ঠানে আলতা শাড়ীর সাথে একখানি বেতার যন্ত্র বর–কনের যৌতুকের সামগ্রী হিসেবে চাহিদা–পত্রে সন্নিবেশিত থাকে।

টেলিভিশন

৪.১. দারিদ্র পীড়িত ও অশিক্ষিত গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে টেলিভিশন এখনো একটি অত্যাশ্চ্যর্য বিষয়। বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে টেলিভিশনের রঙিন যুগে পদার্পণ এই বিষয়ে আলাদা ব্যঞ্জনা ও অভিযাতের জন্ম দিয়েছে। ষাটের দশকের মাঝ থেকে বাংলাদেশে টেলিভিশন জন্ম নিলেও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের এই চোখ ও মন মোহিনী যন্ত্রটি এখনো একটি অভিজাত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। মধ্যবিত্ত শহুরে প্রায় সব ঘরে টেলিভিশন থাকলেও গ্রামে প্রধানভাবে সমৃদ্ধ পরিবারের একটি আসবাব এটি। খুব কম গ্রামেই এখনো টেলিভিশন সুলভ। হাট–বাজারের কাছাকাছি অবস্থিত ক্লাব, সমিতি বা এই জাতীয় অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাটারী চালিত টেলিভিশন বাংলাদেশে খানিকটা প্রতুল।

৪.২. বাংলাদেশে টেলিভিশন সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর অভিযাত শিশু মনে অত্যন্ত গভীর রেখা পাতের ঘটনা থেকে এই সম্পর্ক মূল্যায়ণ করা সম্ভব যে, যদি গ্রাম পর্যায়ে টেলিভিশন সুলভ করে তোলা যায়, তাহলে এই মাধ্যমে যে কোনো রসাশ্রিত উন্নয়নমূলক 'মেসেজ' সহজেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্র

৫.১. মুদ্রণ মাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রায় দুইশত বছর পূর্ব থেকে এদেশে সংবাদপত্র গণমাধ্যমেব প্রচলন শুরু হয়। তবে নিরক্ষরতা প্রধান বাংলাদেশের খুব কম লোকই এই মাধ্যমের প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভে সক্ষম। মূলতঃ এই দেশের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্যে গণমাধ্যমের এই বিশেষ দিকটি প্রধানভাবে কার্যকর।

৫.২. কারণ যে দেশের দশভাগের নয় ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে, চার ভাগের তিনভাগের বেশী মানুষ যেখানে অশিক্ষিত, পাঁচ ভাগের চার ভাগ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং একটি রুটির দাম যেখানে একটি সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী, সেখানে গণযোগাযোগের বাহন হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা খুব যৌক্তিক কারণেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৫.৩. তবে সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ে বা পড়তে পারে এমন লোকের কাছ থেকে ধারাবাহন ('ডিকোড') হয়ে সংবাদপত্র পরিবেশিত তথ্য বা 'মেসেজ' সাধারণ নিরক্ষর

সমাজে বিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ অঞ্চলে রয়েছে। সেদিক থেকে গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আওতাধীন গণমানুষের সংখ্যা বিস্তৃত।

৫.৪. কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদপত্র নিজেই গণযোগাযোগে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করে রেখেছে। ১৯৮১ সালে প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ–এক জরীপ চালিয়ে দেখেছে যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলি তাদের পাতার দশভাগের একভাগও গ্রামে বসবাসকারী নব্বই শতাংশ মানুষের জন্যে ব্যয় করতে কুন্ঠিত হয়। সংবাদপত্রগুলি তাদের পাতার কুড়ি ভাগের একভাগ অংশ মাত্র মফস্বল সংবাদের জন্যে বরাদ্দ রাখে। জরীপের পরিস্যখ্যানে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম দৈনিক 'সংবাদ। [১২]

৫.৫. শুধু বাংলাদেশ নয়, একই সংস্থার আরেকটি জরীপে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অধিকাংশ সংবাদপত্রই এই ধারা ও নীতিমালা বিশিষ্ট 'শিল্প' বলে পরিচিত। সংস্থাটির জরীপে দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশে ১৯৮৩ সালের ৮টি সংবাদপত্র পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে অর্থনীতি, বাণিজ্য, কৃষি ও শ্রম বিষয়ক উন্নয়ন মূলক গুরুত্ব সম্পন্ন সংবাদ সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, প্রতিনিধিত্বমূলক এই সব সংবাদপত্রে শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ(মেসেজ)–ই এই সময় প্রকাশিত হয়নি। [১৩]

৫.৬. বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলির অবস্থা আরো করুণ। আঞ্চলিক সংবাদপত্রের দেশে দেশে লোকজ মাধ্যমের অন্যতম উপায় ও উপাদান হিসেবে বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশে তা একান্তই ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংবাদপত্র গুলি আঙ্গিক ও সংবাদপ্রবাহ, এই দুই দিক থেকেই নিম্নমানের। প্রধানত স্থানীয় প্রাওপাও, বিজ্ঞাপন, ও নিউজপ্রিন্টের ব্যবসা করার জন্যেই বাংলাদেশের আঞ্চলিক অথবা মফস্বল সংবাদপত্রগুলি ব্যস্ত। গ্রাম বাংলা বা গ্রামীণ মানুষ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে এতে ধরা পড়ে না

৫.৭. এখানকার আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি মুলতঃ শহরকেন্দ্রিক এবং শহরমুখীও। প্রধানভাবে রাজনৈতিক বিষয় ও চলচ্চিত্র ভাবনাই এই সব পত্র–পত্রিকার মুখ্য উপাদান হয়ে আসে। স্থানীয় সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়নের দিকগুলি বস্তনিষ্ঠভাবে খুব কমই স্থান পায়।

৫.৮. স্থানীয় লোকজ মাধ্যমগুলিকে উচ্চকিত করে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি যে ভূমিকা পালন করতে পারতো, তা এভাবেই অপব্যবহৃত হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। অবশ্য বিজ্ঞাপন বন্টনে সরকারী নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা থাকার কারণেও আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি 'কোমর সোজা' করে দাঁড়াতে পারছে না।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে লোকজ অবস্থা

৬.১. বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার লক্ষ লক্ষ কর্মী রয়েছে যারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামের মানুষের সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখে। সরকারের কৃষি বিভাগের মাঠকর্মী এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের জনসংখ্যা কর্মীরা কৃষক ও দম্পতিদের সাথে সরাসরি কথা বলে থাকে এবং সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা সিনেমা ইউনিট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভ্রাম্যমান চলচিত্র প্রদর্শনী করে থাকে। প্রদর্শন শেষে খন্ড সভা করে উন্নয়নমূলক কথামালা প্রচার এদের মুল কাজ।

৬.২. এইসব মাঠকর্মী ছাড়াও বেসরকারী সংস্থা সমূহের কর্মীরাও গ্রামীণ মানুষের নিত্যদিনের উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে কয়েক হাজার বেসরকারী সংস্থার লক্ষাধিক মাঠকর্মী এই কাজে ব্যপৃত রয়েছে।

৬.৩. কিন্তু এই প্রকার মাঠকর্মীরা যে কাজে ব্যাপৃত আছে, তাতে মনে হয় তারা প্রধানত 'চাকুরী' করে। অথচ যে দেশপ্রেমমূলক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে তারা আংশীদার তা কেবলমাত্র 'চাকুরী করা মনোভাব' দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এই জন্যে মাঠকর্মীদের মুল সংগঠন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার– যা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

৬.৪. মাঠকর্মীরা সরাসরি জনগণের কাছে যাবে এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে। এভাবে একজন মাঠকর্মী জনগণের মতামতকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ পায়। গণযোগাযেগের সুবিধাই এখানে। বাংলাদেশে এই কাজগুলি করার জন্যে সরকারী জনসংখ্যা মাঠকর্মী, কৃষি বিভাগের মাঠকর্মী, তথ্য বিভাগের মাঠকর্মী রয়েছে। কিন্তু যোগাযোগ সফলভাবে বাস্তবায়নে যে ধাঁচের প্রশিক্ষিত রাজনৈতিক–সামাজিক অঙ্গীকারের সিভিলিয়ান দরকার এখানে তার অভাব রয়েছে। ফলে লোকজ মাধ্যম গুলিও এদের যথাযথ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

বাংলাদেশের লোকজ মাধ্যম পরিস্থিতি

৭.১. আদিম মানুষ গুহা গাত্রে চিত্র এঁকে রাখতো জ্ঞাপন বা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে। গণযোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের উদ্ভব এখান থেকেই। বিভিন্ন ধ্বনি, সংকেত, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে আদিম মানুষ তাদের তথ্যপ্রচার এবং এ থেকে আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতো। বিনোদনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেদিক থেকে লোকজ মাধ্যমের এই আদিম কৌশল হচ্ছে সকল প্রকার গণযোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম।

৭.২. আধুনিক মানুষের সমাজ জীবন ও বৈষয়িক প্রবৃত্তি আগের সেই গন্ডীতে নেই,এমনকি যুগে যুগে সাংস্কৃতিক গতিধারার ঐতিহ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এতোসব পরিবর্তন, পরিক্রমণের পরও লোকজ মাধ্যমের গুরুত্ব ও মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেনি।

৭.৩. বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যশালী এবং হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দেশ। এ দেশের অকৃত্রিম সংস্কৃতি জগৎ একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হাতিয়ার। গণমানুষের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ ধারা তার সার্থক প্রতিফলন।

বাংলাদেশের লোকজ মাধ্যমের বিভিন্ন দিক এ প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা যেতে পারেঃ–

(ক) *যাত্রা ঃ*

এক বিশেষ ভঙ্গীতে পরিবেশিত নাটক ধাঁচের একটি শিল্প মাধ্যম এটি। অনুষ্ঠান স্থানের একবারে মাঝখানে মঞ্চ থাকে, দর্শক –শ্রোতা এর চার পাশে ঘিরে বসে যাত্রা উপভোগ করে। কুশলীরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে।

মূলতঃ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী নিযে যাত্রার প্লট রচিত হয়। যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা একটু কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগ করে আবেগ–আপ্লুত অভিনয় করেন বলে তা জনগণের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে যাত্রা ছিল আদিম দিনের বিনোদন মাধ্যম। যখন কাজ–কর্ম থাকেনা তখন সারারাত জেগে যাত্রা দেখে জনসাধারণ দিনভর ঘুমে বিভোর থাকতো। যাত্রায় নাটকীয় কাহিনীর মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের সুখ–দুঃখের গান অথবা 'বিবেকের' গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে এই সময়টি 'সঠিক সময়' ('পিক–আওয়াজ') বা 'উপযুক্ত সময়' বলে বিবেচিত হয়। এই সময়টায় দর্শক–শ্রোতা গভীর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে।

জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মৌলিক বিষয়গুলি রসাত্মক ভঙ্গিতে অথবা গানের মাধ্যমে এই সময় জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। অথবা উন্নয়ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতেও যাত্রার কাহিনী রচিত হতে পারে। তাতে অভিনয় ও যাত্রামঞ্চ সজ্জার স্বার্থে ঐতিহাসিক বিষয় জুড়ে দিলেই চলবে। এতে উপস্থিত সমগ্র গ্রামবাসী দেশগঠনে তাদের ভূমিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জনমত গড়ে তুলতে সাহায্যক ভূমিকা পালন করবে।

(খ) *মুক্তনাটক বা পথনাটকঃ*

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্তনাটক বা পথনাটক শিল্প শহর ছেড়ে গ্রাম পর্যায়ে যাত্রা শুরু করেছে। এর উদ্যোক্তা প্রধানভাবে রাজনৈতিক কর্মীরা হলেও জাতিগঠন কাজে সরকারী -বেসরকারী পর্যায়েও তা শুরু করা যায়। কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রমে অবশ্য ইতিমধ্যেই তা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এই মাধ্যমটি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাধারণভাবে নাটকের জন্যে যে বিশেষ মঞ্চ ও পোষাক ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, পথনাটক বা মুক্তনাটকে তা প্রয়োজন হয় না। কাহিনী 'হিসেবেও যে ঘটনাটি এখানে মঞ্চস্থ হয়,তাও কোনো প্রখ্যাত বা জনপ্রিয় নাট্যকারের লেখা থাকেনা। স্থানীয় কোনো ঘটনা বা কাহিনী যা সম্প্রতি ঘটেছে (সাধারণভাবে) তা স্থানীয় কোনো কম শিক্ষিত যুবক বা তরুণই লিখতে পারে এবং স্থানীয় যুবক-তরুণ বা যে কোনো বয়সের নাট্যমোদী এতে অভিনয় করে।

পথনাটক বা মুক্তনাটকের বিশিষ্টতা হল, আনুষ্ঠানিকতার বাহুল্য না থাকায় খুব সুলভেই একটা বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে আয়নার মতো অথবা বলা চলে স্ফটিকের জলের ন্যায় জনগণের সামনে বিষয়টির গুরুত্বসহ ধরা পড়ে এবং সম্মিলিতভাবে জনগণের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মুল বিশেষত্ব এখানেই, অংশীদারিত্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজেদের সক্রিয় উপস্থানায় পরিস্ফুটিত হয় এবং প্রভাব হয় সুবিস্তৃত এবং সুকৌশলী।

(গ) *কবিগান, জারীগান, শারীগানঃ*

এই সঙ্গীত দলগুলি বাংলার জাতীয় লোকজ সম্পদ এবং গ্রাম বাংলার প্রাণ ভ্রমরা। আজো সমগ্র পল্লীবাংলাকে এরাই জাগিয়ে রেখেছে। সারা দিনভর অবিরাম খাটুনির পর সন্ধ্যায় জারী, শারী, কবিগানের জলসায় গ্রামের মানুষকে আনন্দের প্রাচুর্যে আপ্লুত করে তোলে।

কবিগান মূলতঃ দুইজন গ্রামীণ কবির সুরেলা কবিত্বের লড়াই। তাঁরা দু'জন সুমতি ও কুমতির প্রতীক হিসেবে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লড়াই করে। এদের একজন ভালর পক্ষে থাকে এবং ভাল'র বিভিন্ন দিক দর্শক-শ্রোতার কাছে তুলে ধরে। অন্যজন মন্দের পক্ষে থাকে এবং মন্দের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাল-মন্দের লড়াইয়ে ভাল'রই জয় হয় এবং দর্শক-শ্রোতা অফুরন্ত আবেগে করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করে। জারী ও শারীগানও অনেকটা তাই-তবে এই ক্ষেত্রে মূল গায়েনের সাথে আরো সহযোগী গায়েন (যাদের 'দোহার' বলে) সুরে সুরে 'ধুয়া' তোলে। এইসব ক্ষেত্রেও দুটো পক্ষ থাকে, তবে নাও থাকতে পারে।

বৃটিশ ভারতে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গায়েন কবিয়ালরা অত্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। কবিয়াল রমেশ শীল এবং মুকুন্দ দাশের গান বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ-অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেদিক থেকে বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কার্যকক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করতে এই সব কবিগান, জারী ও শারী গানের কোনো বিকল্প নেই।

(ঘ) *গম্ভীরা গানঃ*

এই জাতীয় গান মুলত ঃ রাজশাহী অঞ্চলে অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় গানের ধারা। গম্ভীরা গানে একজন 'নানা' এবং একজন 'নাতী' চরিত্র থাকে। এই নানা নাতীর সুরেলা আঞ্চলিক কথার লড়াইয়ে একটি বিষয় উপস্থাপন করা এবং সুরে সুরে বারবার একটি লাইন 'নানাহে-' উচ্চারিত হয়। ইদানীং গম্ভীরা গানকে জাতীয় গঠন মূলক কাজে ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন 'স্বনির্ভরতা' বিষয়ে গম্ভীরা গানকে ব্যাপক ব্যবহার করে খ্যাতি অর্জন করেছে।

(ঙ) *পালাগানঃ*

এটি একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান। গ্রামের মানুষ এই গানের অনুষ্ঠানকে হৃদয়-মথিত করে উপভোগ করে। রাধা -কৃষ্ণ, রূপাবান, বেহুলার পালা অত্যন্ত প্রিয় পালাগানের আসর বলে পরিচিত। সাধারণভাবে সন্ধ্যার পর গ্রামের নারী-পুরুষ গৃহকর্ম সেরে বড় কোনো উঠোনে এই পালাগানের আসর সাজিয়ে তোলে।

উন্নয়ন -পালার গান রচনা করে এই লোকজ মাধ্যমটিকেও সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

(চ) *পুঁথি পাঠঃ*

অনেকটা ঘরোয়া বৈঠকে, উঠোনে বসে পুঁথি পাঠ বাংলাদেশের জনপ্রিয় মুসলিম বিনোদন অনুষ্ঠান। প্রধানত মুসলমানদের প্রিয়নবী এবং কারবালার ঘটনা (হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক কাহিনী) নিয়ে রচিত পুঁথি পাঠ জনগণের মনকে করুণভাবে আন্দোলিত করে।

এই জনপ্রিয় মুসলিম অনুষ্ঠান রীতিটিকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আধারে বিন্যাস করা সম্ভব। ধর্মীয় চেতনার আলোকে জনসংখ্যা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যাবলীর মৌলিক দিক জনগণের কাছে ফুটিয়ে তুলে হৃদয়গ্রাহী করে উদ্বুদ্ধ করা সহজসাধ্য হবে বলে বিবেচনা করা যায়

(ছ) *পুতুল নাচঃ*

একটি লোকজ, কিন্তু আধুনিক আঙ্গিক বিন্যাসে রূপায়িত পুতুল নাচ ও জাতীয় উন্নয়ন ধারায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু গ্রাম বাংলায় নয়, শহরে শিক্ষিত সমাজেও ছেলে-বুড়ো সকল পর্যায়ে-পুতুল নাচ জনপ্রিয় তার অঙ্গভঙ্গিময় বিশিষ্টতায়। ইতিমধ্যেই পুতুল নাচের বহুল ব্যবহার সফলতা লাভ করেছে।

পুতুল নাচকে এই পর্যায়ে গ্রামবাংলায় সরাসরি প্রদর্শনীতে এনে জাতীয় উন্নয়নের তথ্য প্রদান শিক্ষাদান কর্মসূচীতে আনা সম্ভব।

(জ) *পটঃ*

লোকজ মাধ্যমের অন্যতম উপদান পট শিল্প এখন লুপ্ত হতে বসেছে। অথচ একসময় 'গাজীর পট' নামে গ্রাম বাংলায় মানুষের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত।

একটি বড় কাপড়ের উপর বিভিন্ন কাহিনীর খন্ডচিত্র একে পটুয়ারা তা নিজস্ব সুরে ঘটনাকে বিবৃত করতে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী থেকে শুরু করে গাজী কালু -চম্পাবতীর কাহিনী পটে আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এই লোকজ মাধ্যম বাংলাদেশে এখন একেবারে বিস্মৃত এমন কথা বলা যাবে না। এখনো ফুটপাতে ও হাটে-বাজারে গ্রাম্য ঔষধ বিক্রেতারা পটে বিভিন্ন ছবি এঁকে ঔষধ বিক্রি করে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক, এর প্রয়োজনীয়তা, এর থেকে জনগণের কি কি উপকার হতে পারে, জনগণ এর বাস্তবায়নে কিভাবে অংশ নিতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি পটে এঁকে রাস্তায় কিংবা হাট-বাজারে উঁচু জায়গায় টানিয়ে দেওয়া যায় অথবা একজন মাঠকর্মী বক্তৃতা দিযে তা বুঝিয়ে দিতে পারে অথবা উপযুক্ত গায়েন পটুয়া নিয়োগ করে তা সুরেলা কণ্ঠে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে প্রচারের মাধ্যমে গণযোগাযোগের উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে।

(ঝ) *ভোজ বাজি ঃ*

একই ভূমিকা নিতে পারে এই লোকজ মাধ্যমটি। আধুনিক যাদুবিদ্যা এই গ্রামীণ সংস্করণ 'ভোজাবাজি' থেকেই বিকাশ লাভ করছে:

ভোজাবাজিওয়ালা বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল ও পয়সা তোলে এবং রহস্যময় 'আছে-নাই' খেলা দেখিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে।

জাতীয় সমস্যা-যেমন, গণশিক্ষা অথবা পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে এই বাজিওয়ালাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দিলে জাতীয় উন্নয় কর্মকান্ডে তা সবিশেষ

ভূমিকা পালন করতে পারে। জনমত গঠন প্রক্রিয়ায় তা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(ঞ) *ক্যারাভান:*

লোকজ মাধ্যমের এই বিষয়টি গ্রামবাংলায় এখনো সুলভ। মূলতঃ শোভাযাত্রা সহকারে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ড অথবা অন্য যে কোনো বিষয়কে জনগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার জন্যেই ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান তার ক্ষমতার দশ বছর পূর্তি উৎসব পালন উপলক্ষে ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার করে তথাকথিত 'উন্নয়নের এক দশক' পালন করেছিল। ঢাকা থেকে রেল শোভাযাত্রা করে বিচিত্র রঙ ও চিত্রের ব্যানার সহযোগে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচার কার্যসূচী সম্পন্ন করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘটা করেই ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রচলনের সংবাদ আমরা পাচ্ছি।

গ্রামে বড় ধরণের একটি কুমড়ো বা কাঠাল হলে তা হাতির পিঠে চড়িয়ে অথবা ঢোলবাদ্য বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী প্রদর্শন করে টাকা তোলার প্রচলন রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফলতাসমূহ এইভাবে ক্যারাভান পদ্ধতিতে তুলে ধরে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে আরো উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

(ট) *মেলা:*

বছরের কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম-গঞ্জে মেলা বসে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন রকম সওদা নিয়ে মেলায় এসে থাকে। মেলার মৌসুমে জড়ো হয় বিভিন্ন রকম প্রদর্শনীর।

জাতীয় উন্নয়ন ধারা সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য এই মেলাগুলিতে পসরা সাজিয়ে জনগণকে অবহিত করে জনমত সংগঠন করা সম্ভব।

আজকাল এই মেলার অনুকরণেই - কৃষি মেলা, শিল্প মেলা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এ থেকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারে।

(ঠ) *হাট বাজার:*

গ্রামে নিকটস্থ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিনই বাজার বসে এবং সপ্তাহে এক বা দুইদিন হাট বসে থাকে। নানা গ্রামের মানুষ এই সময় বেচা -কেনা করতে এই সব যায়গায় সমবেত হয়।

ভিয়েতনাম তার বিপ্লবের পর গণশিক্ষা কার্যক্রম চালাতে গিয়ে হাট-বাজারকে ব্যবহার করে সফলতা অর্জন করে। হাট-বাজারের চারদিকের প্রবেশ পথে বড় করে বর্ণমালা লিখে 'সাইনবোর্ড' টানিয়ে রাখা হতো। গণশিক্ষা কর্মীরা জনগণকে

প্রবেশ পথে একবার এবং প্রস্থান করার সময় একবার সাইনবোর্ডের সামনে নিয়ে যেতে এবং একবার করে প্রথমে থেকে শেষপর্যন্ত বর্ণমালা পড়তে বাধ্য করতো। এমনি করে মাসের পর মাস এই কার্যক্রম নিয়মিত গতিতে চালু থাকায় ভিয়েতনাম গণশিক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য সফলতা অর্জন করে।

বাংলাদেশেও গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করতে এই রকম হাট-বাজারকে ব্যবহার করা যায়। প্রধানভাবে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে অধিক সফলতা অর্জন করতে এই লোকজ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা অধিক যুক্তি সঙ্গত হবে।

জাতীয় সমস্যাগুলির অন্যান্য সমাধানেও হাট-বাজারকে ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষ করে এই সময় মাঠকর্মীগণ বিভিন্ন খন্ডসভা করে জনমত সংগঠন করার কাজে হাট-বাজারের স্বাভাবিক জমায়েতকে কাজে লাগাতে পারে।

(ড) *খেয়াঘাট*

খেয়া পারাপার বা ফেরী পারাপার করার সময় যে ঘাট ব্যবহার করা হয় সেই সময়ও ক্ষণিকের জন্যে নিয়মিত জমায়েত সংগঠিত হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং এই সম্পর্কে জ্ঞানদান করার ক্ষেত্রে খেয়াঘাটও একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(ঢ) ***ওয়াজ মাহফিল ঃ***

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজে ওয়াজ মাহফিল -অনুষ্ঠান করা একটি নিয়মিত ঘটনা। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও ধর্ম কথা আলোচনার জন্যে সারা বছরই ওয়াজমাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ধর্ম কথার সংগে দেশপ্রেম ও জাতিগঠনের কোনো বিরোধ নেই, বরং তা একটি পরিপূরক কার্যক্রম। কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে ব্যাপকভাবে এই বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বরং কোনো কোনো সময় ওয়াজ মাহফিলকে জাতীয় উন্নয় কর্মকান্ড বিরোধী কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সমর্থন করে পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। এই সব উদ্ধৃতির আলোকে জাতীয় আলেম সমাজের মাধ্যমে গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে কুসংস্কারমুক্ত পল্লী সমাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

গ্রামবাংলার এই লোকজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি জাতীয় কর্মকান্ডের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। জাতীয় পরিকল্পনাবিদদেরকে তা গভীরভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ জাতীয় জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে যে কারণে অধিক সফলতা লাভ সম্ভব হচ্ছে না-তাহলো ধর্মীয়ভাবে জনসংখ্যা

নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শত বছরের অপপ্রচার। সুতরাং এই অবস্থা থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হচ্ছে, প্রকৃত ধর্মীয় কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং জনগণকে ধর্মীয় ভাবেই জনসংখ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা।

(ণ) *মিলাদ মাহফিল :*

বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি ঘরোয়া মুসলিম অনুষ্ঠান মিলাদ মাহফিল। মুসলমান সমাজের প্রিয় নবীর নামে দোআ ও দরুদ পাঠের জন্যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মিলাদ মাহফিলের জন্মও ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ –বিরোধী নিষিদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্যে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্যে মুসলমান নেতারা ঘরোয়া বৈঠক করে সেই সময় মিলাদ মাহফিলের আড়ালে রাজনৈতিক আলোচনায় বসতেন।

মিলাদ মাহফিলের সময় কতকটা ধর্ম–কথাও আলাপ হয়ে থাকে। এই সময় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও নৈতিকতা সম্পর্কে জাতীয় আলেম সমাজ বক্তব্য রাখতে পারেন। তাহলে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকেই জাতীয় সমস্যাগুলির বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে পারতো। জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা ইসলামী –চেতনার বিরোধী নয়, ধর্মসভায় এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা যায় এবং এতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেবে।

(ত) *কৃষ্ণকীর্তন উৎসব :*

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের একটি জনপ্রিয় উৎসব কৃষ্ণকীর্তন। বিভিন্ন পালা –পার্বনে নির্দিষ্ট কতকগুলি স্থানে চিরাচরিত রীতিতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানকে 'মহোৎসব'ও বলা হয়েথাকে।

ভক্ত–হৃদয় বিগলিত করে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই কৃষ্ণকীর্তনে অংশগ্রহণ করে। চিরায়ত এই লোক ধর্মানুষ্ঠানকে জাতীয় উন্নয়নের ধারার সাথে মেলানো সম্ভব। ধর্মকথার সাথে সাথে ভক্তদের মনে উন্নয়ন কর্মসুচীতে তাদের সক্রিয়তার বিষয়টি উথাপন করা যায়।

(থ) *সাপ খেলা :*

বাংলাদেশের বেদের দল কর্তৃক গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনপ্রিয় সাপখেলা প্রদর্শিত হয়। এতে তারা সুরেলা কন্ঠে 'লখাই –বেউলা' (লখিন্দর –বেহুলা)–র গান করে দর্শক শ্রোতার মন জয় করে।

গ্রাম বাংলায় অত্যন্ত লোকপ্রিয় এই লোকজ অনুষ্ঠাটি জাতীয় উন্নয়ন কর্মধারার প্রচার কার্যে নিয়ে আসা যায়। এতে অতিরিক্ত আর যে কাজটি হবে, তা হল যাযাবর পদ্ধতির জীবনধারী এই সম্প্রদায়কে অনুৎপাদনশীল পেশা থেকে উৎপাদনশীল পেশায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। একই সাথে ঝার, ফুঁক, তাবিজ, সিঙ্গা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর টোটকা চিকিৎসা থেকেও তাদের বিরত রাখা সম্ভব হবে।

(দ)*গ্রাম সভা ঃ*

গ্রাম বা পাড়ায় স্থানীয় ভাবে মাণ্যবর গুরুজন শ্রেণী থেকে এক বা একাধিক মাতব্বর ঐতিহ্যগত ভাবেই থাকেন। দিনাবশেষে পাড়ার নিরক্ষর–অক্ষর সকল শ্রেণীর মানুষের জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় মাতব্বরের বাহির বাড়ীর ঘরে অথবা দহলিজে (একে অনেক জায়গায় 'বাংলাঘর' বলা হয়)। হুক্কা টানতে টানতে সেই জমানো 'আড্ডা বিশেষে' দেশ –গ্রাম পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। অনেক সময় এতে বিচার–সালিশও চলে। মাতব্বরের কথা গ্রামের দশজন শোনে ও মান্য করে।

লোকজ মাধ্যমের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জাতীয় উন্নয়ন ধারার সাথে এই মাতব্বর শ্রেণীর মান্যবরদের যুক্ত করলে সমাজ ও দেশ অত্যন্ত লাভবান হবে। সমাজের এখনো এঁরাই 'মাথা' বা গ্রামীণ ভাষায় খুঁটি। এমনকি জনগণ নির্বাচনের সময়ে তার একান্ত গোপনীয় ভোটটি পর্যন্ত এই গ্রামসভায় মাতব্বর শ্রেণীর পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করে নেয়।

সেদিক থেকে সরকার ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এই লোকজ– ব্যবস্থাটিকে গণযোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। যদি এতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে জনমত সংগঠনের অত্যন্ত বুনিয়াদী ভিত্তি এ থেকে সৃষ্টি হবে।

উপ..ংহার

৮.১. গণযোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে লোক মাধ্যমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বড় দিকটি হল, এর দ্বারা দ্রুত এবং বাস্তবিক অর্থেই জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। মাধ্যমটি যেমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় তেমনি সহজসাধ্য এবং আয়াসসাধ্যও।

৮.২. লোকজ–মাধ্যম একদিকে জনগণকে দিচ্ছে তার বিনোদন, অন্যদিকে লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিও রক্ষা পাচ্ছে এর প্রতি বিদগ্ধজনের সচেতনতার জন্যে। একই সাথে জাতীয় উন্নয়ন প্রচারের বস্তুগত সহয়তা এখান থেকে পাওয়া সম্ভব।

৮.৩. লোকজ মাধ্যম শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার দারিদ্র পীড়িত নিরক্ষর জনগণেরই উপযোগী গণযোগাযোগী মাধ্যম নয়, শহর কিংবা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সকল বিত্তের বাংলা ভাষা-ভাষী, এমনকি যে কোনো ভাষা-ভাষীরই আন্তর্জাতিক মাধ্যম এটি। এ প্রসংগে একটি উদ্ধৃতি স্মর্তব্য-'কেবলমাত্র গ্রামীণ সমাজে কিংবা কম উন্নত স্থানে লোকায়িত মাধ্যমের উপযোগিতা বেশী, একথা সর্বাংশে সত্যি নয় বরং বলা চলে সকল ভাবপ্রবণ ও সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর কাজে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মানব সংযোগ প্রক্রিয়া।'[১৪] আর এই প্রক্রিয়া দুনিয়ার দেশে দেশে এখন শুরু হয়েছে। লোকজ মাধ্যমে জনগণের অনুভূতি সঞ্চারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে (এশীয় দেশগুলোতে) মালয়েশিয়ার নাম অগ্রগণ্যঃ

'Malaysia has also been using folk media or traditional communication media as means of reaching people outside urban area. Since early 1970's, Malaysia Information Deparment has been employing flok media to Communicate development and other message to rurla audiences......
However, it should be noted that the Malaysian government has yet to utilise the various forms of traditional media in the country......
..... The fact that rural media are more useful and relevant to the rural people in Mylaysia especially with regard to their development, is yet to be recognised'

৮.৪. বাংলাদেশ সরকারের ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক অধিদপ্তর, বিভাগ ও শাখা রয়েছে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব ও উদ্বুকরণ নিশ্চিত করতে, কৃষি বিভাগের রয়েছে আলাদা তথ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরেরও রয়েছে, মাঠকর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মী, মাদক বিরোধী প্রচার অনুবিভাগ গঠিত হয়েছে অতিসম্প্রতি, পরিবেশ দুষণ মুক্তির প্রচার শাখাও রয়েছে। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ রয়েছে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে। কিন্তু প্রতিটি বিভাগ ও শাখা বাংলাদেশে আলাদা আলাদা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এদের কোনো সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। যে ফলাবর্তন বা জনমত প্রতিক্রিয়া ('ফিডব্যাক') পাওয়া যায় তাও সুমঞ্জস্য না হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে পরিশ্রম অনেক ক্ষেত্রেই পন্ডশ্রমে পরিণত হচ্ছে। একটি সমন্বয় কেন্দ্র তৈরী করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগে বাংলাদেশে লোকজ মাধ্যমগুলিকে সংগঠিত উপায়ে পুনর্বিন্যাস করে কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে এর সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগের সফলতার উপরে।

তথ্যপঞ্জী

১. Many Voices, One World' (সুবিখ্যাত ম্যাকব্রাইড কমিশনের প্রতিবেদন গ্রন্থ) পৃ, ৪৭ – ৬৭।

২. বিশ্বব্যাংকের ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর পঞ্চম দরিদ্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩. Just Faaland, J. R. Parkinson, Bangladesh the Test case of Development, C. Hurst and company and university press limited, Dhaka, 1979,P: 5,197.

৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বর্ষপঞ্জি গ্রন্থ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা : ৩,৪।

৫. ঐ' পৃষ্ঠা : ৪

৬. ঐ' পৃষ্ঠা : ৫৫

৭. ঐ' পৃষ্ঠা : ৩৭

৮. ঐ' পৃষ্ঠা : ৫০৩

৯. ঐ' পৃষ্ঠা : ৯৯

১০. ঈমান 'অর্থ সৃষ্টি কর্তার প্রতি বিশ্বাস।

১১. জাতীয় গণমাধ্যম ইনিসটিটিউট , ঢাকায় তথ্য কর্মকর্তাদের কর্মশিবির প্রতিবেদন, ৬ নভেম্বর, ১৯৮৮।

১২. জাতীয় দৈনিকে মফঃস্বল সংবাদের স্থান' শিরোণামের জরীপ, প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ১৯৮১।

১৩. 'আঞ্চলিক সংবাদপত্র ও আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রবাহ'–শীর্ষক জরীপ, প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ১৯৮৩।

১৪. Mohd. Hamdan Haji Adnan, 'Rural Media in Malaysia: A New Trend' , The journal of Development communication gune. 1990, p. 75-76.

জনসংযোগের স্বরূপঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ইমামুল হক

১.০. তিরিশের দশকে যে জনসংযোগের জন্ম পৃথিবী জুড়ে আজ তার ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও আমাদের আর্থ–সামাজিক কাঠামোতে নিতান্ত স্থূল প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে তাকে গণ্য করা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। বর্তমানে যদিও বাংলাদেশের সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই জনসংযোগ বিভাগ খুজে পাওয়া যায় তবুও জনসংযোগের ক্ষেত্র, মাধ্যম ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণাগত বিভ্রান্তির কারণে অনেকে জনসংযোগের সাথে অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব যুক্ত করে দিচ্ছেন কেউ বা এর সাথে, ওৎপ্রোতভাবে জড়িত কিছু বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। ফলে স্বঃভাবতই এর সুস্থ বিকাশ হচ্ছে ব্যাহত। জনসংযোগের পূর্বশর্ত গণতন্ত্র। কিন্তু দীর্ঘদিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অস্থিরতার কারণে ব্যহত হয়েছে আমাদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ, নষ্ট হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের আর্থ–সামাজিক পরিবেশে সৃষ্ট বিশেষ রাজনৈতিক বদ্ধ জলাশয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে জনসংযোগ প্রক্রিয়াটি। প্রকৃত পক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যে যেমন জনসংযোগের প্রয়োজন তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া সমাজে জনসংযোগ বিস্তৃত হতে পারে না। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও জনসংযোগের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠার ক্ষেত্রেঅগনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি বড় বাধা।

১.১. বাংলাদেশে জনসংযোগের বিকাশের গতিধারা সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে জনসংযোগের সামগ্রিক প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জনসংযোগ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। জনসংযোগের একটি মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

১.২. " জনসংযোগ হল এমন এক যোগাযোগ প্রক্রিয়া যা পরিকল্পিতভাবে কোন বিশেষ ধারণা, পণ্য, সেবা বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার জন্য পরিচালিত হয়। জনসংযোগে জনকল্যানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

১.৩. উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে জনসংযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জনসংযোগকার্য পরিচালনা করতে অবশ্যই একটি ধারণা (ieda), পণ্য কিংবা সংগঠন থাকবে–কারণ জনসংযোগ কখনই শূন্যে বিচরণ করে না। এর জন্য একটি বিষয় (পণ্য, ধারণা ও সংগঠন) অবশ্যই থাকতে হবে এবং এগুলো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে হবে। আর এটিই হল জনসংযোগ কাজের প্রথম বৈশিষ্ট।

খ. জনসংযোগ একটি পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কতাপূর্ণ প্রক্রিয়া, আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন কোন ব্যাপার নয়। জনসংযোগে অত্যন্ত সর্তকভাবে পরিকল্পনা করা হয়। জনসংযোগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে এবং তাকে কার্যকর করা হয়। জনসংযোগের তৎপরতা সমূহ অবশ্যই কতগুলো সত্য ধারণা ও লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন ভাল পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যা কখনো স্বল্প মেয়াদী আবার কখনো দীর্ঘমেয়াদী। এই পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যাপক চিন্তা ভাবনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। জনসংযোগের মাধ্যমে যেহেতু অনেক সময়ই কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ, পণ্য কিংবা সেবাকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে তাদের মনে একটা সমর্থক ধারা তৈরির চেষ্টা করা হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে জরীপ ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটি কোন সমাজ নিরপেক্ষ কর্মকান্ড নয়। কাজেই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মনোভাব যাচাই করেই জনসংযোগ কাজের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।

গ. পারস্পরিক সমঝোতা জনসংযোগের অন্যতম মৌলিক শর্ত। জনসংযোগ একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং অবশ্যই তা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। উন্নত জনসংযোগে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় তথা একটি যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং উৎস ও প্রাপক উভয়ের মন থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের চিহ্ন দূর করা যে কোন জনসংযোগ কর্মসূচীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। জনসংযোগের কাজই হল ভুল বোঝাবুঝি ও অসমঝোতা দূর করে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. জনসংযোগকে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। একটি বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে জনসংযোগ। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যেন জনসাধারণের কাছে বোধগম্য এবং প্রশংসনীয় হয় সেদিক লক্ষ্য রাখাই জনসংযোগকর্মীর প্রধান কাজ। এজন্য জনসংযোগ কর্মীকে অবশ্যই জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না যে, জনসংযোগ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র।

ঙ. ব্যাপক জনগোষ্ঠী জনসংযোগের আওতায় জনগণ বলে বিবেচিত হয় না। একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করাই জনসংযোগের কাজ। জনসংযোগে Public বা জনগণ বলতে সাধারণতঃ একই সাধারণ স্বার্থভুক্ত group বা দলকে বুঝায় যাদের কাজ ও মতামত সংগঠনকে এবং সংগঠনের কাজ ও নীতিমালা তাদেরকে প্রভাবিত করে। জনসংযোগে জনগণ বা Public কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১। আভ্যন্তরীণ জনগণ বা internal public:- যারা সরাসরি সংগঠনের সাথে জড়িত এবং যাদের সাথে প্রাত্যহিক রুটিন ওয়ার্কের মাধ্যমে সংগঠন যোগাযোগ রাখতে পারে।

২। বাহ্যিক জনগণ বা external public:- যারা সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নন কিন্তু সংগঠনের কার্যক্রমে আগ্রহ আছে এবং সংগঠনের স্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থও বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এই দুই শ্রেণীর জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভিন্নতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই জনসংযোগ কর্মসূচী এমন হতে হবে যাতে উভয়েরই সার্থের প্রতিফলন ঘটে।

চ. বলা হয়ে থাকে, যে, জনমত Public policy তৈরি করে এবং জনসংযোগ জনমতকে প্রভাবিত করে থাকে। জনসংযোগের মাধ্যমে জনমতকে অনুকূলে আনার এবং অনুকূলে রাখার চেষ্টা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হনলুলু শহরের একজন প্রসিদ্ধ জনসংযোগ কর্মকর্তা Rey Laffingwell জনমত প্রভাবনে জনসংযোগের ভূমিকাকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে ব্যাখা করেনঃ–

১। জনমত যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে অনুকূল মত তৈরির চেষ্টা করতে হবে।

২। অনুকূল জনমতকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। জনমত অনুকূলে না থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

জনসংযোগ পদ্ধতি ঃ

২.১. ষাটের দশকে হাওয়ার্ড ষ্টিফেনসন জনসংযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি মডেল প্রদান করেন। হাওয়ার্ড ষ্টিফেনসনের মতে, জনসংযোগ একটি বৃত্তাকার প্রক্রিয়া, যার শুরু ও শেষ গবেষণার মাধ্যমে। মডেলটি বৃত্তাকার হলেও এক বিন্দুতে কখনো মেশে না এবং------ এটি একটি Platform –এর–উপর দাঁড়িয়ে থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ষ্টিফেনসনের বৃত্ত ধারণায় ৫ টি উপাদান আছে যার প্রথম ও পঞ্চমটি গবেষণার উপর নির্ভরশীল।

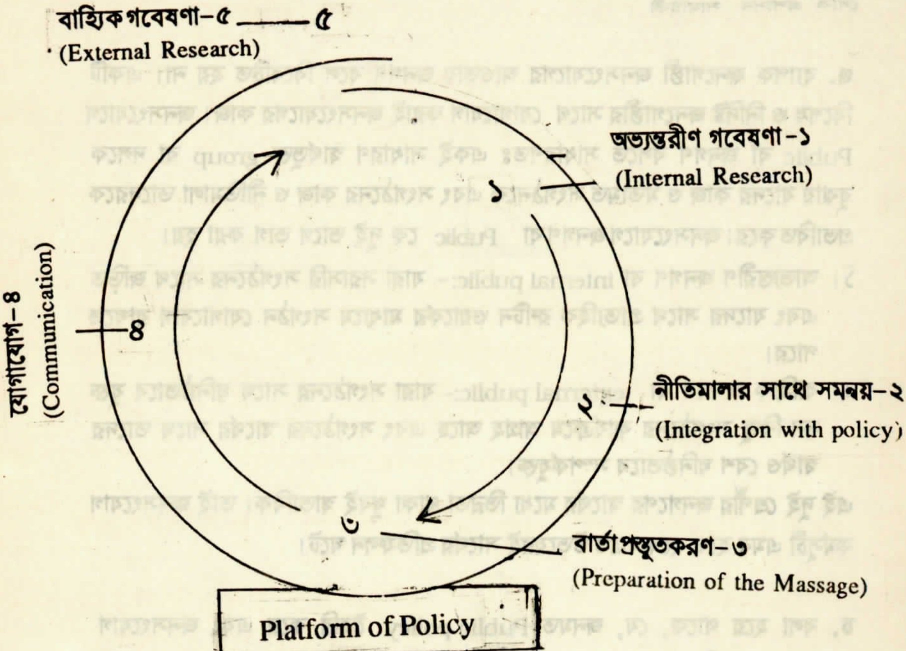

(১) অভ্যন্তরীণ গবেষণাঃ এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে ধারণা, তথ্য, ও মনোভাব সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণার কাজ শুরু করা হয়। নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মকর্তাকে ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরের বিভিন্ন মূল্যবোধ সম্পর্কে গবেষণা করতে হয়। এই পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সদস্য এবং তাদের মনোভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জনসংযোগ কর্মকর্তা ও তার সহকর্মীদের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিস্তারিত তথ্য, ঘটনা, প্রতিবেদন, ব্যাখ্যা, ছবি, রেকর্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। জনসংযোগ কোন তাৎক্ষণিক কর্ম সম্পাদনের জন্যই সংগঠিত হয় না – দীর্ঘদিনের জন্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটা ভিত্তি গড়ে তোলাই অভ্যন্তরীণ গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য। নিজ সংগঠনকে অনুধাবনের জন্যও এই গবেষণা অপরিহার্য।

(২) নীতি মালার সাথে সমন্বয় ঃ জনসংযোগ প্রক্রিয়াটি হল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্য ক্রম। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত নীতিমালাই সংগঠনের কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সংগঠনের কোন বিশেষ নীতিমালা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিংবা সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের স্বার্থেই তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি প্রয়োজন। একটি সংগঠনের স্পষ্ট বর্ণিত নীতিমালার সাথে অভ্যন্তরীণ গবেষণা থেকে

প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের সমন্বয় করাই হল জনসংযোগ পদ্ধতির এই পর্যায়ের কাজ। এই সমন্বয় ছাড়া জনসংযোগ কর্মে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

(৩) বার্তা প্রস্তুত করণ ঃ সংগঠন ও তার জনসাধারণের মধ্যে সমঝোতা তৈরির প্রচেষ্টাই জনসংযোগ প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট। তাই সংগঠনের বক্তব্য বার্তা আকারে জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে হয়। এই বার্তা তৈরিতে জনসংযোগ কর্মীকে অত্যন্ত কৌশলী হতে হয়। বার্তা তৈরিতে প্রতিষ্ঠানের ভাবমুর্তি ও বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। কোন বার্তা প্রেরণের আগেই তার স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, প্রয়োজনীয় তথ্য বার্তায় আছে কি না ইত্যাদির পাশাপাশি বার্তাটি সংগঠনের ইমেজকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করছে কি না কিংবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিষয় আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

(৪) যোগাযোগ ঃ সংগঠনের নীতিমালার সাথে অভ্যন্তরীণ গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির যথার্থ সমন্বয় ঘটিয়ে উপযুক্ত বার্তা তৈরি করেও জনগণের সাথে যদি কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা না যায়। তবে জনসংযোগের মূল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই জনগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে জনসংযোগকর্মীকে মাধ্যম নির্বাচন, উপস্থাপনার সঠিক উপকরণ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। জনগণের সাথে সংগঠনের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যেই জনসংযোগের সাফল্য নিহিত। তাই একজন জনসংযোগ কর্মীকে অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী যোগাযোগকারী হতে হয়।

(৫) বাহ্যিক গবেষণা ঃ জনসংযোগের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষে বার্তা প্রেরণের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হল তার প্রেক্ষিতে সেই জনগোষ্ঠীর সাড়া কি রকম হলো সে বিষয়ও জনসংযোগকর্মীকে জানতে হবে। এ জন্য গবেষণার প্রয়োজন। অনেক সময় প্রেরিত বার্তা বিকৃতভাবে প্রাপকের কাছে পৌছাতে পারে বা বার্তা হারিয়েও যেতে পারে। একজন জনসংযোগ কর্মীর মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত প্রকৃতপক্ষে ঘটনা কি ঘটেছে এবং ফলাফল কি হল কিংবা কি রকম হতে পারে সে বিষয় সংগঠনের ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা। বার্তা প্রেরণের ফলে প্রকৃতই কি ঘটেছে এবং তার প্রভাব কতটুকু তা জনসংযোগ কর্মীর জানা দরকার। গবেষণার মাধ্যমে তাকে জেনে নিতে হবে কোন ধরনের বার্তা যোগাযোগের কোন মাধ্যমে প্রেরণ করলে তা নির্দিষ্ট শ্রেণীকে সর্বাধিক প্রভাবিত করবে। কোন ধরনের বার্তা কোন ধরনের মাধ্যমে অধিক কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম সে বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা জনসংযোগকর্মীর থাকা বাঞ্চনীয়।

২.২. ষ্টিফেনসনের মতে জনসংযোগ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই একটি জনসংযোগ নীতি মালার সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ব্যবস্থাপনার লোকদের কাছে প্রায়শই

জনসংযোগ অস্পষ্ট ও রহস্যময় বিষয় হয়ে থাকে। তাই ব্যবস্থাপনার লোকদের সামনে জনসংযোগনীতির স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

২.৩. চল্লিশ দশকের শেষ দিকে কয়েজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের জনসংযোগ নামক নতুন পেশায় পদার্পনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের জনসংযোগের বিকাশ। ধারণার দিক দিয়ে তখনও প্রচারের হাতিয়ার ছাড়া জনসংযোগ উন্নততর কিছু বিবেচিত না হওয়ার কারণেই হয়তো আমাদের জন্য সোনালী ফসলের কোন ঐতিহ্য রেখে যেতে পারেন নি পূর্বসূরীরা। স্বাধীন বাংলাদেশে জনসংযোগ ক্রমান্বয়ে যোগাযোগের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় সর্বত্রই জনসংযোগকর্মী নিয়োগ ও জনসংযোগ বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু জনসংযোগের কিছু মৌলিক বিষয়ে তখনও বিভ্রান্তি থেকে যায়। তুলনামূলকভাবে প্রতি বছরই জনসংযোগের পেশায় অধিক লোকের সমাগম ঘটলেও জোর দিয়ে বলা যাবে না যে বাংলাদেশে জনসংযোগ একটি পূর্ণাঙ্গও স্বাধীন পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.৪.এই ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান করণই হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জনংসযোগ নীতির অনুপস্থিতি। আমাদের দেশে কেবলমাত্র জরুরী সময়েই জনসংযোগের ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কোন আকস্মিক দূর্ঘটনা, কিংবা বিশেষ কোন কারণে প্রতিষ্ঠানে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে বা নাজুক পরিস্থিহির সৃষ্টি হলে কেবল জনসংযোগকে ব্যবহার করা হয়। একটি সার্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা না করে সাময়িকভাবে বিশেষ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তাৎক্ষণিক ও অস্থায়ী ভিত্তিতে কার্যসাধনের একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে জনসংযোগের ব্যবহার করছি আমরা – এই ব্যবস্থাকে "fire alarm approach" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে আগুন লাগার পরই কেবল অগ্নিনির্বাপক প্রতিষ্ঠানকে ডাকা হয়। জনমতের নিয়মিত পর্যালোচনার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়মাবলীই যে যথাযথ ও কল্যাণকর জনসংযোগ কর্মসূচীর নিয়ামক হওয়া উচিত এ বিষয়টি এখনও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩.০. প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশের অনুপস্থিতিও আমাদের জনসংযোগ প্রক্রিয়ার সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড়– অন্তরায়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অব্যবস্থার কারণে একটি সুস্থ্য গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের শাসক শ্রেণী জনসমর্থনকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না এবং জনমতের প্রতি সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধাশীলও নন। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্বিমুখিতা বা আদান প্রদান বিবর্জিত এক তরফা নীতি গড়ে উঠেছে সর্বত্র। ফলে স্বভাবতই ব্যাহত হয়েছে জনসংযোগের স্বাভাবিক বিকাশ। পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাপক শিল্পায়নই সেখানকার জনসংযোগ প্রক্রিয়ার সুস্থ্য বিকাশ ও বিস্তৃতিকে তরান্বিত করেছে। আমাদের দেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তেমন এগুতে পারে নি, এরপরও যেটুকু শিল্পায়ন ঘটেছে তাও ব্যাপক দুর্নীতিকে আশ্রয় করে। ফলে সব সময়ই উৎকোচ ও উপঢৌকনের সাথে জনসংযোগের একটি সর্ম্পক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। শিল্পপতিরা

কেবল আর্থিক লাভকেই বিবেচনা করছেন যদিও জনসংযোগ করা হয় আর্থিক লাভ এবং সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য।

৩.১. আমাদের দেশে এখনও অনেকেই জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রেস এজেন্ট এর সাথে মিলিয়ে ফেলেন। হ্যান্ড আউট, প্রেস রিলিজ, বিভিন্ন সংশোধনী ইত্যাদি তৈরী ও বিতরণ করাই জনসংযোগকর্মীর একমাত্র কাজ বলে মনে করা হয়।

৩.২. প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনসংযোগ কর্মকর্তার কোন অংশীদারিত্বকে আমরা এখনও স্বীকৃতি দিচ্ছি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বক্তৃতা লিখে দেবার কাজের মধ্যেই জনসংযোগ কর্মকর্তার ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয় প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তার ভাবমূর্তি গঠনের বা তথ্য তৈরিতে Human projector হিসেবেই জনসংযোগকর্মীকে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটি অবশ্যই জনসংযোগ কর্মীর দক্ষ ও কার্যকর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়।

৩.৩. জনসংযোগ কর্মীদের তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী মূল্যায়নের অনুমোদন দেয়া হয় না অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মূল্যায়নের ক্ষমতা জনসংযোগ কর্মীর না থাকায় প্রক্রিয়া হিসেবে জনসংযোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। কর্মসূচী মূল্যায়নের বিষয়টিকে অনেকেই অর্থ ও সময়ের অপচয় মনে করেন। অথচ ফলাবর্তন জানতে না পারলে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে স্থির হওয়া যায় না। জনসংযোগ যে একটি নিয়মিত পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়া–ব্যবস্থাপকগণ এটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই রকম ভ্রান্ত ধারণা ও মনোভাবের কারণে আমাদের জনসংযোগকর্মীরা প্রায়ই জটিল ও বিশৃংখল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন।

৩.৪.আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগকর্মী নিয়োগ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়োগ বিধি নেই। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা লোকদের এই পেশায় গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের অভিজ্ঞতায় জনসংযোগ সম্পৃক্ততা একেবারেই নেই। ফলে এদেরকে যখন কোন নির্দিষ্ট জনসংযোগের কাজ দেয়া হয় তখন তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনেকে যে কোন উপায়ে কার্য সিদ্ধিকেই জনসংযোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষাগত পটভূমি এবং অভিজ্ঞতা না থাকায় আমাদের জনসংযোগকর্মীরা প্রায়ই জনসংযোগকে প্রপাগান্ডা, পাবলিসিটি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সাথে গুলিয়ে ফেলেন।

৩.৫.এসব ছাড়াও জনসংযোগকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তথা তাদের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিও আমাদের জনসংযোগের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। ইন সার্ভিস ট্রেইনিং এর জন্যও কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের নেই। সময় ও শ্রম দিয়ে এ পেশায় অনেকে নিজেদের স্থাপন করতে পেরেছেন ঠিকই

কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে জনসংযোগের আধুনিক ধারার সাথে পরিচিত হতে তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছেন।

৪.০. জনসংযোগ যে একটি বিশেষ (specialised) পেশা। এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহ থাকার কোন সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগকর্মী নিয়োগের সময় এই বিষয়ে তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত পটভূমিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। যত দিন না বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসংযোগ সম্পর্কে তাদের বর্তমান দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিবর্তন আনবেন এবং জনসংযোগকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলবেন ততদিন আমাদের দেশে জনসংযোগের ক্ষেত্রে সুস্থ্য ও বিজ্ঞান–সম্মত কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশের তৈরী হবে না একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

পাদটিকা

১ Marston. E. John. The Nature of Public Relations, p. 37.

২ Q. A. I. M. Nuruddin. Public Relation in Bangladesh, শীর্ষক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের বিশেষ স্মারকে প্রকাশিত।

৩ Stephenson. Howard. Handbook for Public Relalions. Second Edition. Mcraw Hillbook Company p.18 to 27.

নথি–ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

সৈয়দ শামসুল আলম

ভূমিকা

১.১. বর্তমান বিশ্বে সকল দেশের সরকারের কার্য পরিধি বিস্তারের সংগে সংগে প্রশাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অফিস আদালতে নথির সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক দেশেই নথি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের বিষয়টি উত্তরোত্তর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এজন্য ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে নিজস্ব ভবন, আসবাবপত্র ও কর্মকর্তা/কর্মচারী, যেমন অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত, তেমনি সেই প্রতিষ্ঠানের যে সকল দাপ্তরিক কাজের আদেশ, নির্দেশ, মতামত ও সিদ্ধান্ত সমুহ পত্রের মাধ্যমে লিখিত ভাবে নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১.২. বাংলাদেশে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহে নথি–পত্রাদির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পদ্ধতি চালু থাকলেও দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের নথি ব্যবস্থাপনা ও তার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রথমে নথি পত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সরকার প্রবর্তিত দু'টি ম্যানুয়াল/পুস্তক ''বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়াল ১৯৪৩'' এর এবং ''সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬''এর প্রধান নির্দেশসমুহের বাস্তব প্রয়োগের সুবিধা অসুবিধা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর উক্ত চিহ্নিত বিষয়ের আলোকে সমভাব্য উন্নয়নের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিশেষে উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসাবে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

নথি ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন

২.১. নথি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি ''রেজিষ্ট্রি প্রণালী'' সর্বপ্রথম প্রাচীন রোমে প্রবর্তিত হয়। তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ/বিচারকগণ এই ব্যবস্থা চালু করেন। প্রাচীন কালে রোমান বিচারকগণের নিকট বিচার সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নানাবিধ মামলা মকদ্দমা আসত। এই সকল মামলা মকদ্দমা যেহেতু একদিনে নিষ্পত্তি সম্ভব ছিলনা, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাদের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত নোট বা টোকা সংরক্ষণ করতেন। এরমধ্যে উক্ত মামলা-মোকদ্দমা সমুহের সাক্ষী, বাদী ও বিবাদীর বক্তব্যসহ সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সমূহ স্থান পেত (খন্দকার মাহবুবুল করিমঃ আরকাইভ প্রশাসনঃ৮। পরবর্তীতে এই সকল নোট বা টোকার পরিমাণ এমনভাবে বেড়ে যায় যে মামলা-মোকদ্দমা সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২.২. পাক-ভারত উপমহাদেশে নথি ব্যবস্থাপনা চালু হয় ১৮৫৪ সনে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক রেকর্ড প্রণয়নের মাধ্যমে (পি, আর, দাস গুপ্ত ঃ ১৯৪৩)। এই রুলস প্রণয়ন হলেও সামগ্রিক ভাবে তা কিভাবে ব্যবহৃত হবে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য ১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার প্রফেসর জি,ডব্লিউ, ফরেষ্ট নামক একজন বিশেষজ্ঞকে তদানীন্তন বৈদেশিক বিভাগের নথি সমুহ পরীক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন (ওয়েন রাইটঃ ১৯৪৩)। প্রফেসর ফরেষ্ট তার প্রতিবেদনে সুপারিশ করেন যে, প্রশাসন সংক্রান্ত নথিপত্র/দলিল/ দস্তাবেজ একটি কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রস্তাবটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং প্রফেসর ফরেষ্ট সাহেবকে উক্ত রেকর্ড সমুহের অফিসার ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়। ফলে ১৮৯১ সনের ১১ ই মার্চ কলকাতায় ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট স্থাপিত হয় পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের ফলে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট সেখানে চলে যায়। এটি বর্তমানে ''দি ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইন্ডিয়া'' নামে পরিচিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক সরকার প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীতে প্রায় সকল প্রদেশসমূহ কম বেশী স্বায়ত্ব শাসনের আওতায় চলে আসে, ফলে প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব রেকর্ড রুলস প্রণীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বেঙ্গল-আসাম প্রদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেঙ্গল-আসাম, প্রদেশোধীন সকল কালেক্টরেট এবং তাদের অধীনস্ত অফিস সমুহের নথিপত্র লিখন, সংরক্ষণ এবং বিনিষ্ট করণের জন্য ১৯৪৩ সনের ২০ শে অক্টেবর ''বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়াল'' নামে একটি নিজস্ব পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। সেই থেকে বেঙ্গল এবং আসাম প্রদেশে সকল কালেক্টরেট এবং অধীনস্ত অফিস সমুহে নথি পত্র ব্যবস্থাপনা এই ম্যানুয়াল মোতাবেক চলে আসছে। (লো ইলৃটিস এবং ওয়েণ রাইনঃ ১৯৬৯)।

২.৩. পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরসমূহের অপ্রচলিত নথি সমুহের শ্রেণী বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা যথাক্রমে প্রাক্তণ পাকিস্তান সরকারের সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ৭০-৮১ নং নির্দেশাবলী (পৃঃ নং ৭৩-৮০) এবং প্রাক্তণ পুর্ব-পাকিস্তান সরকারের সচিবালয় নির্দেশ নং ৯১-১০২ (পুঃ নং ১০৩-১০৬) অনুযায়ী হতে থাকে। কিন্তু এই সকল নির্দেশমালা যেহেতু বিভিন্ন সময়ে জারী হয়, ফলে সকল দপ্তরে এর ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগ হয়ে উঠেনি। এজন্য পূর্ব-পাকিস্তানে সকল প্রশাসনিক দাপ্তরিক কার্যাবলী "বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়াল" অনুযায়ী চলতে থাকে।

২.৪. বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের প্রায় চার বৎসর পর ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সচিবালয় থেকে জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিজস্ব কোন ম্যানুয়াল বা নির্দেশমালা ছিলনা। এজন্য সচিবালয় এবং জেলা পর্যায়ের সরকারী কাজকর্ম ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব এবং বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে সচিবালয় দাপ্তরিক কার্য পরিচালনা দারুনভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনার আংগিকে সচিবালয় নির্দেশমালা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়নের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে কমিটি সচিবালয় নির্দেশমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৭৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারী খসড়াটি অনুমোদিত হয় (বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬)।

২.৫· মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৭৬ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী কার্যবিধিমালা (Rules of Business) ১৯৭৫ এর ৪ (১০) নং বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত নির্দেশমালাটি "সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭৬" নামে প্রকাশ করে। মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশমালা যথাযথ ও সতর্কতার সাথে পালনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সবিবৃবন্দকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে বাংলাদেশে উল্লেখিত নির্দেশমালার অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারের অধীনস্ত কালেক্টরেট ও দপ্তর সমুহে পালন করার কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে স্বাধীনতার প্রায় দু'যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরও এই নির্দেশমালা পালন ও প্রয়োগ সচিবালয়ের বাইরে হবে কিনা এই প্রশ্নটি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট অমিমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ সচিবালয়ের বাইরে অবস্থিত সরকারী দপ্তর এবং কালেক্টরেট সমুহে ১৯৪৩ সালের বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়াল' বর্ণিত নির্দেশমালা চলে আসছে এবং সচিবালয়ের মধ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭৬ চালু আছে। একই দেশে দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দু'ধরনের নির্দেশমালা প্রতিপালন এবং অনুসরণ শুধু জটিলতার সৃষ্টি করছে তা নায় বরং দাপ্তরিক যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্য-পরিচালনা দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

নথি ব্যবস্থাপনার প্রধান দিক সমূহঃ

৩·১· আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান অনুসারে নথি ব্যবস্থাপনাকে (Recond Management) ফলপ্রসূ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ·ও প্রক্রিয়া অনুসরণ অপরিহার্য (এলডারসনঃ ১৯৮৬)। সরকারী দপ্তরসমুহের মুলতঃ জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য সেক্টর ভিত্তিক সেবা প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধিই–প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তব্য (Duties) বন্টন নামা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলের উপর ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

৩.২. এরূপ একটি বিজ্ঞান সম্মত সাংগঠনিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অফিস ছোট মাঝারী এবং বড় যে কোন রকম হোক না কেন, দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করতে হবে। যাতে করে শাখার তত্বাবধায়ক/শাখা প্রধান/সহকারী সচিবের দায়িত্বে উক্ত শাখার কার্যাদি সম্পাদন যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে যথাক্রমে (ক) বিভাগ, (খ) উপ–বিভাগ, (গ) ব্রাঞ্চ, এবং (ঘ) শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

৩.৩. পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে দপ্তরে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব বর্ণনা একটি সফল প্রতিষ্ঠানের পুর্ব শর্ত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী মেধা সম্পন্ন লোকবল থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সেবা প্রদান এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়না। এজন্য প্রতিটি সরকারী অফিসে দায়িত্ব বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োগ থাকা আবশ্যক। সরকারী অফিসে এই বিষয়টি প্রতিপালনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, সচিবগণ তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতা বন্টনের বিষয় নির্ধারণ করবেন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্ম সম্পাদনের প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষমতাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারী করবেন (সচিবালয় নির্দেশমালা–১৯৭৬ঃ৩)।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

৪·১ স্বাধীনতার প্রায় দু'দশক পেরিয়ে যাবার পথে অথচ এখনও দেশে নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দু'টি ধারা চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয় এর বাইরে অর্থাৎ জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত কালেক্টরেট সমুহে এবং উপজেলা সমুহে ১৯৪৩ সালে প্রণীত ''বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়েল'' অনুসারে নথি পত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ হচ্ছে। অপরদিকে

মন্ত্রণালয় সমুহে সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬ মোতাবেক নথি পত্রাদি সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। দু'টি ধারা প্রবর্তনের ফলে শুধু যে নথি পত্র সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, বরং সরকারী অফিস সমুহে পত্রাদি লিখনেও দু'টি ধারা চালু রয়েছে। এতে একই কর্মকর্তা যখন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থাকছেন তখন তাকে একটি ধারায় নথি পত্রাদি সংরক্ষণ ও লিখতে হচ্ছে। আবার ঐ কর্মকর্তা যখন সচিবালয়ে ফিরে মন্ত্রণালয়ের কর্মরত থাকছেন তখন অপর একটি ধারা অনুসরণ করছেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এই দু'ধারা চালু থাকার ফলে মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয়ে কোন ক্ষেত্রে কিরূপ পত্রাদি লিখতে হয় তা সঠিকভাবে জানা না থাকার দরুন নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন কর্মকর্তা কর্মক্ষেত্রের বেশীর ভাগ সময় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন বলে নথি ব্যবস্থাপনার সেই পুরানো ধারাটির সাথে তিনি পরিচিত রয়েছেন। ফলে সচিবালয়ে প্রবর্তিত ধারাটির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ আদৌ পাননি। এজন্য সচিবালয়ে কর্মরত কোন কর্মকর্তার পত্রটি ভিন্ন ধারায় লিখিত হচ্ছে। এতে করে একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.২. এজন্য সরকার এদিকটা চিন্তা করে সচিবালয় নির্দেশমালা-৭৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যন্ত সকল সরকারী অফিসে একক ধারা প্রবর্তনের জরুরী নির্দেশ দিতে পারে। ফলে সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একক ধারা পরিচিত হবে, তেমনি নথি পত্রাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সমতা বজায় থাকবে। এটা করতে হলে মাঠ পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্য্যন্ত একটি সুষম সমন্বয় সাধন করা একান্ত অপরিহার্য।

৪.৩. সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নিয়মিত সংযুক্ত দপ্তর ও অধিদপ্তর সমূহের মধ্যেও নথি ব্যবস্থাপনার ধারা একরূপ নয়। ফলে মন্ত্রণালয় বহির্ভূত অধিদপ্তর ও সংস্থা সমুহে পৃথক পৃথক ধারা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ সরকারী পর্যায়ে সমনয়ের মাধ্যমে এই সকল পৃথক পৃথক ধারা পরিবর্তন করে একক ধারা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে সকল সরকারী অফিসে ''নথি ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ'' পালনের মাধ্যমে এই একক ব্যবস্থা/ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৪.৪. সচিবালয় নির্দেশমালায় একটি নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়ে পত্র টাইপ করে অনুলিপি প্রসংগে বলা আছে যে কোন পত্র ১২টির অধিক হলে ষ্টেন্সিল করে দিতে হবে। এবং ১০০টির অধিক কপি করতে হলে সরকারী মুদ্রণালয় থেকে ছাপিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে ডুপ্লিকেটিং মেশিনের সাহায্যে শতাধিক অনুলিপি করা সম্ভব এজন্য যেক্ষেত্রে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুহের পত্র এক হাজার কপির অধিক হলে মুদ্রণালয় থেকে ছাপানোর নির্দেশ দেওয়া এবং সে ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন হতে পারে।

৪.৫. নথি বিনষ্ট করণ প্রসংগে যে সকল নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে। সে সকল নির্দেশাবলীর মধ্যে শাখা প্রধান ও সহকারী সচিবের দায়িত্বে পত্রাদি বিনষ্ট করণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শাখা প্রধান ও সহকারী সচিব একেবারে সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করে। একটি মন্ত্রণালয়ের নথি পত্রাদি বাছাই ও বিনষ্ট করণের বর্তমানে প্রচলিত নির্দেশটি বাস্তবতার আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আধুনিক বিশ্বের রাষ্টসমুহে যথা–ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রথার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নথি পত্রাদি মূল্যায়ন ও বিনষ্ট করণের জন্য যুক্তরাজ্যে দ্বি–স্তর পদ্ধতি (Two stage Review System) এবং যুক্তরাষ্ট্রে অপসারণ তালিকা পদ্ধতি (Disposal Schedule System) চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও নথি–পত্রাদি বিনষ্ট করণের জন্য অনুরূপ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত এ, বি, সি, এবং ডি পদ্ধতিতে চিহ্নিত নথি সমূহ পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যায় এবং ঐ সকল নথির ভবিষৎতে কোন জাতীয় বা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আসবে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করে সকল প্রকার নথি দ্বিতীয় বার মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই পর্য্যায়ে মূল্যায়নের সময় যখন নথিসমূহ ২৫ বৎসর বা তার চেয়ে অধিকার রাখবার প্রয়োজন রয়েছে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত সচিবালয় বা পরিদপ্তরের সংরক্ষণাগারে রাখা যায় এবং ২৫ বৎসরের অধিক অর্থাৎ স্থায়ী নথিসমুহ জাতীয় আরকাইভস পাঠানো যেতে পারে। আরকাইভসে কেবল দেশের ঐতিহাসিক এবং জাতীয় প্রয়োজন আসবে এমন সব নথি যথাক্রমে সচিবালয়/পরিদপ্তর সংরক্ষণাগার থেকে স্থানান্তর করে আনা উচিত। উন্নত বিশ্বের প্রায় সকল দেশে আরকাইভস, লাইব্রেরী ও যাদুঘরে এই ধরনের সকল মুল্যবান রেকর্ড সমুহ সংরক্ষিত হচ্ছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং বৃটেনের বৃটিশ মিউজিয়াম ও আরকাইভস এই দায়িত্ব পালন করছে। এই নথির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে উন্নত দেশসমুহ তাদের ঐতিহাসিক নথিপত্রাদি মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছে। বাংলাদেশে অনুরূপ প্রযুক্তির সাহায্যে ঐতিহাসিক নথি সমুহ মাইক্রোফিল্ম করে নথির সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। এমনকি কম্পিউটারের মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পাশ্চাত্য দেশ সমুহ যেমন বিপুল সংখ্যক নথি পত্রাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার চালু করেছেন সে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নথিপত্রাদি সংরক্ষণ করতে পারেন।

৪.৬. দেশে জাতীয় আরকাইভস ছাড়াও অন্যান্য সংস্থায় নিজস্ব সংরক্ষণাগার গড়ে উঠতে পারে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়,আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ব্যাংক, শিল্প ও কৃষি গবেষণাগার, বাণিজ্য সংস্থা, রেলওয়ে, সামরিক, ও আধাসামরিক দপ্তর ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য বর্তমানে দেশে প্রতিটি জেলার কালেক্টরেটে ২৫ বৎসর বা তদুর্ধ

সময়ের নথিপত্রাদি সুচীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই সকল নথিপত্র আর বিলম্ব না করে মুল্যায়নের পর জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করা উচিত।

৪.৭. সরকারী অপ্রচলিত নথিপত্র ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের অজান্তে হয়ত এমন মূল্যবান দলিল ও নথিপত্রাদি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র আমাদের জাতীয় স্বার্থে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐ সকল দলিল ও পত্রাদি সংগ্রহ করে জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করা উচিত। এজন্য সরকারের উচিত দেশের প্রসিদ্ধ গবেষক, ঐতিহাসিক ও দলিল সংরক্ষকদের নিয়ে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে নথি সংরক্ষণ কমিশন গঠন করা।

৪.৮. এছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালায় সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকেও সরল সহজ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোন একটি নথি তিন বৎসর পর্যন্ত প্রশাসন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োজন না হলেও মুল্যায়ন এ বিচার করে সংগে সংগে সংরক্ষণাগারে পাঠানো যায়। অধুনা অপ্রচলিত নথিপত্রের মধ্যে কোন্‌গুলো দ্বিতীয় ও শেষ মুল্যায়নের জন্য রাখা হবে এবং কোন্‌গুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিনষ্ট করা হবে সেটাই হলো প্রথম মুল্যায়নের উদ্দেশ্য। যেগুলো দ্বিতীয় বা শেষ মুল্যায়নের বা পুনর্বিচারের পর বাছাই রকা হলো সেগুলোকে সচিবালায় সংরক্ষণাগারে রাখা যায়। সচিবালয় সংরক্ষণাগার থেকে ঐ সকল নথির জন্ম থেকে ২৫ বৎসর পর মুল্যায়ন করে যেগুলো স্থায়ী হিসেবে রাখা দরকার সেগুলো জাতীয় আরকাইভসে পাঠানো প্রয়োজন। এজন্য সচিবালয় নির্দেশমালায় বর্ণিত মুল্যায়ন পদ্ধতির চেয়ে প্রস্তাবিত মুল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যে নথি সংরক্ষণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সেই নথি সমুহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে মুল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

কতিপয় প্রস্তাবনা

৫.১. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ–

(ক) নথি ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ, বিনষ্ট করণ ও লিখনের জন্য একক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারী পর্যায়ে নির্দেশ প্রদান ছাড়াও নথি ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ উদযাপনকরা যেতে পারে।

(খ) ''সচিবালয় নির্দেশমালা–১৯৭৬'' শীর্ষক ম্যানুয়েলটি বর্তমান সময়ের চাহিদা মোতাবেক পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারী,

আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় প্রবর্তন করা যায়। এছাড়া মাঠ পর্য্যায়ে জেলা সদরের কালেক্টরেটসমুহে এবং উপজেলা পর্যায়ের অফিস সমুহ চালু করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

(গ) একক ধারা চালু করার জন্য নথি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের (Institutional Traning) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিপিএটিসি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে কর্মকর্তাদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারে। এছাড়া প্রতিটি সরকারী অফিসে নথি ব্যবস্থাপনার উপর অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের (On the Job Training) ব্যবস্থা করে এই সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কর্মচারী পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণের জন্য আরপিএটিসি–কে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) অফিস প্রশাসন ও নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্ট নথি পত্রাদি একটি দেশ ও জাতীয় জীবনে মূল্যবান দলিল। এই দলিল আমাদের প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য জাতীয় আরকাইভস-এ সংরক্ষণ করা উচিত। এজন্য বর্তমানে সচিবালয় নথি সংরক্ষণাগারে রক্ষিত নথি সমুহের প্রশাসনিক কাজ শেষ হয়ে গেলে ঐ নথিসমুহের অনুলিপি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভসের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আরকাইভস নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(ঙ) নথি বিনষ্ট করণ পদ্ধতিঃ বর্তমান উন্নত দেশসমূহ প্রচলিত অপসারণ তালিকা পদ্ধতি (Disposal Sichedule System) অথবা (খ) দ্বি–স্তর মুল্যায়ন পদ্ধতি (Two Stage Review System) মধ্যে ভারত ও যুক্তরাজ্যে প্রচলিত শেযোক্ত পদ্ধতিটি আমাদের দেশে চালু করা যেতে পারে।

উপসংহার

৬.১. সর্বোপরি একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনস্বীকার্য। প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্ট নথি পত্রাদি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এজন্য দেশ তথা জাতীয় স্বার্থে আমাদের একটি সুষ্ঠু সুন্দর নথি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। তাই নথি ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান লাভের জন্য প্রশাসনিক ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যাদি, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর ধতরাবাহিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও কর্মধারার বিকাশ সম্বন্ধে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বিশেষে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে উপরোক্ত নিয়মাবলীর মৌলিক দিকগুলো জানা থাকলে দৈনন্দিন অফিস ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন ও দাপ্তরিক কার্যাদি নিষ্পত্তি ও সম্পাদন সহজ হবে বলে বিশ্বাস।

পুস্তক নির্দেশিকা

১। খোন্দকার মাহবুবুল করিম, আরকাইভ প্রশাসন, ১৯৮০।

২। লো-ইন্টিস এবং ওয়েন রাইট (সম্পাদিত) , গভর্ণমেন্ট আরকাইভস ইন সাউথ এশিয়া, ১৯৬৯।

৩। বোর্ড অব এক্সিকিউটিভস, বেংগল, বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়েল, ১৯৪৩।

৪। বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৮৭।

৫। নাসিম আঞ্জুমা, অফিসব্যবস্থাপনা, ১৯৮৭।

৬। পেয়ার আহমেদ চৌধুরী, অফিসব্যবস্থাপনা, ১৯৮৬।

৭। শামেস মার্ক, অফিসপ্রসিডিউরএন্ডম্যানেজমেন্ট, ১৯৮৫।

৮। এন্ডারসন, এ, অফিস ম্যানেজমেন্ট, ১৯৮৩।

৯। এম, এম, আল-ফারুক, সরকারী অফিস ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, ১৯৮৯।

ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

কাজী হাসান ইমাম

১.০. ভূমিকা ঃ

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য একটি বাধ্যতামুলক পাঠ্যক্রম। ১৯৮৪ সাল থেকে সরকারী অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বভার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কে অর্পণ করা হয়। পাঠক্রমটির মেয়াদ মূলতঃ চার মাস। ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে "বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জের" পর্যালোচনা করে পাঠ্যক্রমটির মেয়াদ চার মাস থেকে কমিয়ে দু'মাস করা হয় এবং প্রশিক্ষণের জের শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব আংশিকভাবে দেশের অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপরও অর্পণ করা হয়। নতুনভাবে ডিজাইনকৃত এই পাঠ্যক্রম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম নামে অভিহিত।

ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সেপ্টেম্বর ২৩–নভেম্বর ২২, ১৯৯০ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। বিপিএটিসি কর্তৃক পরিচালিত এই পাঠ্যক্রমটিতে ৮টি ক্যাডারের সর্বমোট ২১২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে একজনকে অনিবার্য কারণবশতঃ অব্যহতি প্রদান করা হয়। ২১১ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১৭৭ জন পুরুষ ও ৩৪ জন মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন। নিম্নে তাদের ক্যাডারভিত্তিক বিভাজন প্রদান করা হলো ঃ–

অংশগ্রহণকারীগণের ক্যাডার ভিত্তিক বিভাজন

ক্রমিক নং ক্যাডার	ক–শাখা			খ–শাখা			গ–শাখা			
	মহিলা	পুরুষ	মোট	মহিলা	পুরুষ	মোট	মহিলা	পুরুষ	মোট	সর্বমোট
১। প্রশাসন	০৫	১০	১৫	০৫	১১	১৬	০৩	০৯	১২	৪৩
২। স্বাস্থ্য	০৪	৩৩	৩৭	০৭	২৮	৩৫	০৭	৩৬	৪৩	১১৫
৩। অর্থনীতি	০১	০২	০৩	০০	০২	০২	০০	০২	০২	০৭
৪। বিচার	০০	০৬	০৬	০০	০৬	০৬	০১	০৪	০৫	১৭
৫। খাদ্য	০০	০২	০২	০০	০২	০২	০০	০১	০১	০৫
৬। তথ্য (প্রকৌশল)	০০	০২	০২	০০	০৩	০৩	০০	০৩	০৩	০৮
৭। আনসার	০০	০৩	০৩	০০	০২	০২	০০	০২	০২	০৭
৮। সচিবালয়	০০	০৩	০৩	০১	০৩	০৪	০০	০১	০১	০৮
৯। নন ক্যাডার (বিপিএটিসি)	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০১	০১	০১
মোট	১০	৬১	৭১	১৩	৫৭	৭০	১১	৫৯	৭০	২১১

কেন্দ্রের নির্ধারিত নিয়ম মোতাবেক পরিচালিত প্রতিটি পাঠ্যক্রমকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে এই মূল্যায়ন দৈনন্দিন মনিটরিং, কোর্স সমাপনী মুল্যায়ন, মৌখিক মুল্যায়ন, বক্তা মূল্যায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়কে অন্তর্ভূক্ত করে। মূল্যায়নের এই তথ্যসমূহ প্রধানতঃ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম প্রশাসনও বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক দৃষ্টিকোণে পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন করে থাকেন। চলতি প্রতিবেদনে ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মূল্যায়নের তথ্য ও উপাত্ত এবং সুপারিশ সমূহ খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ববর্তী দু'টি পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। আবার প্রয়োজনে কোথাও কোথাও পাঠ্যক্রমের অংশগ্রহণকারীদের শাখাভিত্তিক উপাত্ত প্রদর্শিত হয়েছে।

২.০ দৈনন্দিন মনিটরিং ঃ

(ক) সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ঃ কোর্স অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রায় সকল অংশগ্রহণকারী মতামত দিয়েছেন।

(খ) অনুকরণীয় নিয়ম শৃঙ্খলা ঃ "কেন্দ্রের রুটিন মাফিক কাজকর্ম প্রশংসার দাবী রাখে। সময়ের মূল্যায়ন এই কেন্দ্রে যেভাবে হচ্ছে তা দেশের সর্বস্তরে আদর্শ হিসেবে অনুকরণীয়"।

(গ) অন্যান্য সংযোজন : বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে "অভিজ্ঞতা বিনিময়" পর্বটি একটি অনন্য ও উপভোগ্য সংযোজন।

(ঘ) ডরমিটরীতে পানি বিভ্রাট : মাঝে-মধ্যেই ডরমিটরীতে পানির অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিক প্রশিক্ষণের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের আরও সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) বিপিএটিসিতে বেমানান :বহুমুখী ভবনের ভেতরে ও চারপাশের উৎকট গন্ধ এবং অবহেলিত পরিবেশ বিপিএটিসির মত মনোরম পরিবেশে বেমানান ক্ষতের মত।

(চ) শ্রেণীকক্ষ অধিবেশনে দীর্ঘসূত্রীতা : প্রায়শঃই দেখা যায় (বিশেষভাবে অতিথি বক্তা ও উর্ধ্বতন অনুষদ বক্তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত যে, অনেকেই শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন শেষ করতে দেরি করেন। ফলে দু'টি অধিবেশনের মাঝখানের সময়টা প্রশিক্ষার্থীরা কোন বিশ্রাম পাননা। এতে পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ছ) সাঁতার শিক্ষা : নদী-মাতৃক দেশে সাঁতার শেখা অত্যন্ত জরুরী। বুনিয়াদী প্রশিক্ষনার্থীদের যারা সাঁতার জানেন না, তাঁদেরকে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

(জ) হ্যান্ড-আউট সংক্রান্ত : প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার অন্ততঃ ৩/৪ দিন আগে হ্যাণ্ড-আউট সরবরাহ করলে ভাল হয়।

(ঝ) গবেষণা কার্যক্রম : ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের গবেষণা পদ্ধতি ছিল খুবই উপযোগী। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

(ঞ) পর্যালোচনা অধিবেশন : কিছু কিছু পর্যালোচনা অধিবেশন যথেষ্ঠ মান-সম্মত হয় না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

(ট) ক্রীড়া সংক্রান্ত : কোর্স প্রশাসন অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনেক সময় খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। এতে নানা জাতীয় অসুবিধা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কোর্স প্রশাসন বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা থাকলে তা দাপ্তরিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। তাহলেই উল্লিখিত জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।

(ঠ) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অনুষদের উপস্থিতি : অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় কোর্স প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রেকটর মহোদয় উপস্থিত থাকলে প্রতিযোগিতা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তাঁদের উপস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের একান্তভাবেকাম্য।

(ড) খেলাধূলা সম্পৃক্ত নোটিশ সংক্রান্ত : বিভিন্ন বিষয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় সম্পর্কে অনেক সময়ই অনেক প্রশিক্ষণার্থী অনবহিত থাকেন না। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময়সূচী সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে সার্বিকভাবে অবহিত হতে পারেন সে দিকে ক্রিড়া শাখার আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

(ঢ) বিদ্যুৎ সংক্রান্ত : বিদ্যুৎ চলে যাবার কারণে শ্রেণীকক্ষে মিডিয়ার ব্যবহার এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে তাৎক্ষণিক বিকল্প ব্যবস্থা (জেনারেটর) থাকা প্রয়োজন।

৩.০· কোর্স সমাপানী মূল্যায়ন ঃ

৩.১ . পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলপ্রসূতা ঃ

ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলপ্রসূতার মাত্রা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এমনকি একাদশ ও দ্বাদশ পাঠ্যক্রমের তুলনায় এর ফলপ্রসূতার মাত্রা অনেক বেশী ছিল (নিম্নে সারনী দ্রষ্টব্য)।

একাদশ, দ্বাদশ ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক তুলনামূলক ফলপ্রসূতার মাত্রা

উদ্দেশ্য	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)		
	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ
(ক) সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনগত ভূমিকা উপলদ্ধিকরণ	৭৩	৬৮	৮০
(খ) নির্ধারিত বিষয়সমূহে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করণ	৭৪	৭০	৭৬
(গ) বিভিন্ন ক্যাডারের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা	৬৮	৭৫	৮০
(ঘ) উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া	৭৬	৭৪	৭৮
(ঙ) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের ব্যবহারিক দিক–গুলির সাথে অংশগ্রহণকারীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া	৬৯	৬৪	৭১
(চ) কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করা	৭৩	৭৪	৮১
(ছ) ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী ও নিয়মশৃংখলা মেনে চলার মানসিকতা সৃষ্টি করা	৭৭	৭৬	৮৩
(জ) অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত মনোভাব গঠণে সহায়তা করা	৭১	৭১	৭৫
(ঝ) ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।	৬৩	৬৭	৭৩

৩·২· *পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক ফলপ্রসূতা ঃ*

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, প্রতিবেদিত পাঠ্যক্রমটির শিক্ষা সফর, রাষ্ট্রীয়কার্যে সুশীল সেবকের ভূমিকা, প্রশাসনে নৈতিকতা, রচনা লিখন ইত্যাদি

বিষয়গুলো ফলপ্রসূতার প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি। সামগ্রিক বিচারে বিষয়ভিত্তিক ফলপ্রসূতার মাত্রা একাদশ ও দ্বাদশ পাঠ্যক্রম থেকে ভাল হলেও ক্ষেত্রবিশেষ তুলনামূলক নিম্নমান দেখা যায় (নিম্নে সারণী দ্রষ্টব্য)।

একাদশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ভিত্তিক ও তুলনামূলক ফলপ্রসূতা।

বিষয়	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)		
	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ
(ক) বাংলাদেশ চর্চা	৭২	৭২	৭৪
(খ) লোক প্রশাসন	৮০	৭৫	৮০
(গ) উন্নয়ন অর্থনীতি	৭৭	৭১	৭৯
(ঘ) অফিস ব্যবস্থাপনা	৭৩	৭২	৮০
(ঙ) কর্মী ব্যবস্থাপনা	৭১	৭০	৭৫
(চ) টার্ম পেপার	৭৫	৭০	৭০
(ছ) সভা পরিচালনা	৭৭	৮০	৭৩
(জ) মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রম	৮৪	৮৮	৮৪
(ঝ) শিক্ষা সফর	৬৭	৬৭	৬৩
(ঞ) রাষ্ট্রীয়কার্যে সুশীল সেবকের ভূমিকা	৭৬	৭০	৬৩
(ট) প্রশাসনে নৈতিকতা	৭৭	৭৩	৬৫
(ঠ) রচনা লিখন	৫৫	৬৭	৬১
(ড) সাঁতার প্রশিক্ষণ	–	–	৭১
(ঢ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন	৭৫	৭৫	৭৪

৩·২·১· *মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ ঃ*

শিক্ষা সফর যাতে আরো ফলপ্রসূ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষা সফরে কি কি অন্তর্ভুক্ত থাকবে সে ব্যাপারে অনুষদ থেকে কোর্স প্রশাসনকে একটি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রদান করা উচিৎ। রাষ্ট্রীয় কার্যে সুশীল সেবকের ভূমিকা ও প্রশাসনে নৈতিকতা বিষয়ক অধিবেশন যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যেতে পারে এবং অধিবেশনসমূহ যাতে অধিকতর ফলপ্রসূ হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। "রচনা লিখন" কার্যক্রমটি বাদ দিয়ে সেস্থলে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে অথবা রচনা লিখন এমন কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হওয়া উচিৎ যে সকল তথ্য অনুষদ তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূরণের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও উপস্থাপিত বিষয়ের

উদ্দেশ্যভিত্তিক গাইড লাইন থাকা প্রয়োজন এবং লিখিত প্রতিবেদন যাতে বিশ্লেষণধর্মী হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

৩·৩· *লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের সবল দিকসমূহ ঃ*

(ক) প্রশিক্ষণার্থীদের নিজের মতামতপ্রকাশের সুযোগ বেশী (২৭)

(খ) পড়াশুনার চাপ ও আগ্রহ থাকে। ফলতঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অধিকতর কার্যকরী হয় (৫৮)

(গ) নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সুযোগ বেশী (২৫)

(ঘ) মেধা যাচাই সম্ভব (২৩)

(ঙ) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক (২৬)

(চ) স্বল্প সময়ে অধিক জনের মূল্যায়ন সম্ভব (১৮)

(ছ) ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (২১)

(জ) অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও চিন্তার পরিধি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অনুধাবন করার ক্ষমতা ইত্যাদি কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা সঠিকভাবে বোঝা যায় (১৬)

(ঝ) নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (১৪)।

৩·৪· *লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের দুর্বল দিকসমূহঃ*

(ক) বিষয়বস্তু আত্মস্থ করার থেকে মুখস্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে (৪২)

(খ) সময়ের স্বল্পতার কারণে সার্বিক মূল্যায়ন সঠিক হয় না (২৫)

(গ) পরীক্ষার হলে নকল করার প্রবণতা (২০)

(ঘ) অত্যধিক মানসিক চাপের ফলে ভীতির সঞ্চার হয় (২১)

(ঙ) পরিদর্শকগণ অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন না (৮)

(চ) অন্তর্মুখীনতা (৯)

(ছ) প্রায়োগিক দিকটা উপেক্ষিত হয় (৩৬)

(জ) রচনামূলক প্রশ্ন তৈরী (ক্ষেত্রবিশেষে) (১৪)

(ঝ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধাস্বরূপ (৭)।

৩·৫· বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠ্যক্রম উপদেষ্টার কার্যক্রমের ফলপ্রসূতাঃ

মূল্যায়নের দিক	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
	ক	খ	গ	গড়
(ক) সার্বিক তত্ত্বাবধানের মান	৬৭	৬৯	৭২	৬৯
(খ) অংশগ্রহণকারীদের সংগে যোগাযোগ	৬২	৫৯	৬৯	৬৩

৩·৫·১ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ ঃ

পাঠ্যক্রম উপদেষ্টা হিসেবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে সাধারণতঃ এম ডি এস পর্যায়ের কর্মকর্তা সংযুক্ত থাকেন। কার্যতঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে কদাচিৎ। সুতারাং তাঁর সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন কতটা যথাযথ সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কোর্স উপদেষ্টার যোগাযোগ আরও নিবিড় করা যায় কিনা বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

৩·৬· বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠ্যক্রম পরিচালকের কার্যক্রমের ফলপ্রসূতাঃ

বন্ধনীর মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের দিক	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
	ক	খ	গ	গড়ে
(ক) পাঠ্যক্রম পরিচালনায় পেশাদার ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা	৯৩	৮৯	৯১	৯১
(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন নিরূপণে দক্ষতা	৯৩	৮৫	৮৭	৮৮
(গ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে কার্যকারিতা	৯৩	৮০	৮৫	৮৬
(ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে ফলপ্রসূতা	৯৪	৮৩	৮৮	৮৮

৩·৭· সংশ্লিষ্ট শাখার কোর্স সমন্বয়কদের কার্যক্রমের ফলপ্রসূতাঃ

মূল্যায়নের দিক	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
	ক	খ	গ	গড়ে
(ক) ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী	৮৭	৫৩	৭৪	৭১
(খ) উদ্যমী	৯০	৫৬	৮০	৭৫
(গ) নিয়মনিষ্ঠ	৮৯	৬১	৮৭	৮৯
(ঘ) কার্যকরী আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কে অধিকারী	৯০	৪৯	৭৫	৭১
(ঙ) নিরপেক্ষ	৮৪	৬৯	৮৬	৮০

৩·৭·১· মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ ঃ

বিপিএটিসির সামগ্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভংগীর সাথে ওরিয়েন্টেশন নেই/হয়নি এমন কোন নূতন কর্মকর্তাকে কোন পাঠ্যক্রমের বিশেষতঃ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের সমন্বয়কের দায়িত্ব দেয়া উচিৎ নয়। উপরোক্ত সারণীতে প্রদত্ত "খ" শাখার সমন্বয়কারীকে কেন্দ্রে যোগদানের পরপরই এই দায়িত্ব দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের সাথে মৌখিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করা হয়েছে।

৩·৮·ডরমিটরী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহঃ

(ক) পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন (৩৭)

(খ) প্রতি দু'জনের জন্য একটি বাথরুম এবং টয়লেট থাকা উচিৎ (৩৫)

(গ) প্রত্যেকের জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ (৩০)

(ঘ) প্রতি কক্ষে আলনার ব্যবস্থা রাখা দরকার (২৫)

(ঙ) টেলিফোন সংযোগ উন্নত করা প্রয়োজন (২১)

(চ) প্রতি চার জনের জন্য একজন রুমবয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার (২২)

(ছ) রুমবয়দের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার (১৯)

(জ) কেন্দ্র থেকে মশারী, চাদর ইত্যাদি সরবরাহ করা উচিৎ (৩৭)

(ঝ) পোকা মাকড় ও মশামাছি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন(২৮)

(ঞ) মেয়েদের রুমে আয়না থাকা প্রয়োজন (১২)

(ট) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সুপারভাইজারদের আরো তৎপর হওয়া দরকার(১৪)

(ঠ) ডরমিটরীকক্ষে টিউব লাইট এর ব্যস্থা করা উচিৎ (১১)

(ড) মহিলাদের নামাজের জন্য ডরমিটরীতে একটি পৃথক রুম থাকা প্রয়োজন (৫)

(ঢ) বালিশ ও তোষকের করুণ অবস্থা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ(১০)

(ণ) রুমে টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (৭)

(বন্ধনীর মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।)

৩·৮·১· মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশঃ

ডরমিটরী সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ নতুন কোন বিষয় নয়। সীমিত সম্পদ ও সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক অভিযোগেরই বাস্তবানুগ সমাধান আপাততঃ সম্ভব নয়। তবে

কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি মাসিক একটাকা হারে সিট ভাড়া কর্তন করা যেতে পারে। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রদত্ত সেবার মান কিছুটা উন্নত করা যেতে পারে। পোকামাকড় দমনের জন্য নেটিং এর ব্যবস্থা করা যায়। দুই বা ততোধিত সিট বিশিষ্ট রুমগুলিতে টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যকীয়।

৩·৯·*ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহঃ*

(ক) ক্যাফেটেরিয়ায় কর্মরত কর্মচারীদের আচার–ব্যবহার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। (৩৫)

(খ) খাবারের গুণগত মান ও আইটেমের বৈচিত্র আনার ব্যাপারে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষে তদারকী ভূমিকা থাকা দরকার। (২১)

(গ) ক্যাফেটেরিয়ায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আরও তদারকী ভূমিকা থাকা উচিৎ (১৫)

(ঘ) পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির গ্লাস সরবরাহ করা উচিৎ (৭)

(ঙ) মেস কমিটি পদ্ধতি বাতিল করতঃ নগদ মূল্যে নিজ নিজ পছন্দ মাফিক খাবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (১৯)

(চ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি (বিশেষতঃ বেসিন, তোয়ালে, থালা, বাসন ইত্যাদি) আরও যত্নবান হওয়া দরকার। (১৪)

৩·১০·*শরীর চর্চা ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ*

(ক) ক্রীড়া প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন (১২)।

(খ) খেলার মাঠের উন্নয়ন প্রয়োজন (৩৩)।

(গ) খেলার মাঠে মুখ্য ক্রীড়া প্রশিক্ষকের উপস্থিতির হার বাড়ালে ভাল হয় (৯)।

(ঘ) সকালের শরীর চর্চা অর্ধঘন্টা এবং বৈকালিক খেলাধূলা এক ঘন্টা করা প্রয়োজন(৭)।

(ঙ) সম্ভব হলে সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লীগ পদ্ধতিতে হওয়া উচিৎ (৮)।

(চ) লন–টেনিস খেলার সুযোগ থাকা প্রয়োজন (১২)।

(ছ) ইনডোর খেলার সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (২০)

(জ) সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ (১৫)।

৩.১১. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে মূখ্য ক্রীড়া প্রশিক্ষকের মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের দিকসমূহ	দক্ষতার মাত্রা (%)			
	ক	খ	গ	গড়
(ক) প্রশিক্ষণ পরিচালনায় পেশাদারিত্ব ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা	৬৮	৭২	৭০	৭০
(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন নিরূপণে দক্ষতা	৬০	৬৫	৬৯	৬৫
(গ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে কার্যকারিতা	৬২	৬৩	৬৯	৬৫
(ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণে ফলপ্রসূতা	৬৩	৬৮	৭০	৬৭

৩.১২. শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

(ক) বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য জেনারেটর থাকা প্রয়োজন (২৩)*

(খ) আলো-বাতাসের স্বল্পতা দূর করা দরকার (৩৫)।

(গ) বর্তমান ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট (৬৭)।

* বন্ধনীর মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

৩.১৩. কোর্স সম্পৃক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা

মূল্যায়নের বিষয়	ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)			
	ক	খ	গ	গড়
(ক) ডরমিটরী ব্যবস্থাপনা	৭৪	৬৫	৭১	৭০
(খ) ক্যাফেটরীয়া ব্যবস্থাপনা	৬৯	৫৭	৬৩	৬৩
(গ) শরীর চর্চা ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা	৭০	৭৩	৭৫	৭৩
(ঘ) শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা	৮৩	৮০	৭৯	৮১
(ঙ) গ্রন্থগার ব্যবস্থাপনা	৮০	৭৮	৮১	৮০

৩.১৪. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে উদ্দেশ্য ভিত্তিকভাবে প্রয়োজনীয় সংযোজনের দিকসময়ঃ

সংযোজনের প্রয়োজনীয় দিক	উদ্দেশ্যে
(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অধিবেশন (৩৫)।	বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের সাথে জড়িত প্রায় সকল কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিধায় তাঁদের এ সম্পর্কে মৌলিক ধারণাথাকা বাঞ্ছনীয়।
(খ) কম্পিউটারের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে অধিক অধিবেশন প্রদান ও বিষয়টি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করণ(১৭)।	উন্নয়নের সাথে উন্নততর প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন।
(গ) আইন বিষয়ে অধিক অধিবেশন থাকা প্রয়োজন (১২)	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।
(ঘ) কৃচ্ছতার মাধ্যমে দারিদ্রের সম্যক উপলব্ধি যাতে আসে সে ধরনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করণ(১০)।	দেশে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী অধিবাসীদের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে কর্ম-কর্তাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য।
(ঙ) উপজেলা প্রশাসনের স্বরূপ ও প্রেক্ষিত (১২)।	বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদান।
(চ) ক্যাডার ভিত্তিক কিছু বিষয়ের সংযোজন (৮)	আন্তঃ ক্যাডার কার্যক্রমের ধারা উপলব্ধিকরণ।
(ছ) আচরণ বিষয়ক কিছু অধিবেশন (১০)	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য।

৩.১৪.১. মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ ঃ

উপরোক্ত বিষয়সমূহ প্রত্যেকটিই বিবেচনার দাবী রাখে। এর মধ্যে ক, খ, ঘ এবং ছ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলী বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। ক ও খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলী

পরিচালিত অধিবেশনের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কৃচ্ছতা সাধন ও দারিদ্রের সম্যক উপলব্ধি আনায়নের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তবানুগ ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা নেয়া যায়। উদাহরণতঃ খাদ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম দিক। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা সপ্তাহে একদিন তাঁদের খাবারের বাজেট অর্ধেক করতে পারেন। উদ্বৃত্ত অর্ধেক সাভারস্থ দুঃস্থ জনসাধারণের কল্যাণকর কোন কাজে ব্যয়িত হতে পারে। তবে এ দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসনের হাতে না দিয়ে কেন্দ্র নিজেই গ্রহণ করতে পারে। এতে বহুমুখী ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 'ছ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টির দায়িত্ব কোর্স প্রশাসনের সরাসরি নেয়া উচিৎ। বিভিন্ন কার্যক্রম ও আচার-অনুষ্ঠানে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণে এগুলো শেখানোর ব্যবস্থা থাকলে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

৩·১৫· *প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতঃ*

সর্বমোট ২১০ জন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিরূপ সমালোচনা করেছেন। বাকী সকলেই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে সুন্দর সুন্দর বিশেষণে ভূষিত করেছেন। এর মধ্যে বন্ধুসুলভ, সহকর্মীসুলভ, নিরপেক্ষ, সৌহার্দমূলক, সুহৃদ, অনুসরণযোগ্য ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য।

৩·১৬· *কোর্সের সবচেয়ে দুর্বল দিকসমূহঃ*

(ক) অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক (২৯)

(খ) সময়ের স্বল্পতা (২২)

(গ) সনাতনী পরীক্ষা পদ্ধতি (২১)

(ঘ) পুরানো হ্যাণ্ড-আউট দেয়া, বাংলায় পড়িয়ে ইংরেজীতে এবং ইংরেজীতে পড়িয়ে বাংলায় হ্যাণ্ড-আউট দেয়া (৩২)

(ঙ) খেলাধূলার ব্যাপারে জোর করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া (১১)

(চ) বিশেষ ক্যাডার প্রীতি (৯)

(ছ) রুটিনের হরদম পরিবর্তন (২৫)

(জ) অতিথি বক্তার উপর নির্ভরশীলতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতিথি বক্তা নির্বাচন(১২)

৩.১৭. *কোর্সের সবচেয়ে শক্তিশালী দিকসমূহঃ*

(ক) অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব (১৩২)

(খ) নিয়ম শৃংখলা (৮৭)

(গ) মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রম (৫২)

(ঘ) সময়ানুবর্তিতা (৬৩)

(ঙ) শরীর চর্চা (২৮)

(চ) পরীক্ষা পদ্ধতি (২৭)

(ছ) উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান (২৭)

(জ) মিথস্ক্রিয়া (২২)

(ঝ) প্রশিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা (৩৫)

(ঞ) পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন (২৩)

৩.১৮. *অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বটি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতঃ*

(ক) প্রয়োজনীয় ও উপযোগী এবং উপভোগ্য (১৭৯)

(খ) আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইল ফলক (১২০)

(গ) বিষয়টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন(১৮)

(ঘ) শ্রোতাদের সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ থাকা উচিৎ (৯)

(ঙ) নিষ্প্রয়োজন (১২)

(চ) এই কোর্সের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রশংসার যোগ্য পদক্ষেপ (১১০)

(ছ) বক্তাদের সময় সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি প্রয়োজন (১০)

(জ) আলোচনা কতগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক হওয়া উচিৎ (২৫)

* বন্ধনীর মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

৩.১৯. *টার্ম–পেপার ও মউক–প্রতিবেদন বাঁধাই ও টাইপিং নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত মতামত ঃ*

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছাড়া বাকী সবাই নানা দৃষ্টিকোণে এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। উক্ত চারজনের মতে অনেকের হাতের লেখা খুবই খারাপ থাকতে পারে বিধায় অপশন থাকা উচিত।

৩·২০· ইনভিজিলেটন বিহীন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণে অংশগ্রহণকারীদের মতামতঃ

(ক) কর্মকর্তাদের সততা একান্ত কাম্য ও প্রয়োজনীয় হেতু এ পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য(১৮)

(খ) নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা আসে (১৩)

(গ) এ পর্যায়ে আসার মত এতটা মন মানসিকতার উন্নয়ন আমাদের এখনো ঘটেনি(৩৭)

(ঘ) প্রশ্নের স্বরূপ এক্ষেত্রে এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় (২৩)

(ঙ) হঠাৎ ইনভিজিলেটর এসে পড়তে পারেন এবং বিশ্বাসের মূল্য নষ্ট হবে এমন ভীতি কাজ করেছে (১৫)

৩·২১· কোর্সের সামগ্রিক উন্নয়নে পরামর্শঃ

(ক) দুপুরর খাবারের পর আর কোন ক্লাশ থাকা উচিৎ নয় (৭৯)

(খ) পরীক্ষার খাতায় নাম ও রোল নম্বর না লিখে ভিন্নতর কোড নম্বর লেখা উচিৎ।যা কোর্স প্রশাসন অথবা মল্যায়ন অনুবিভাগ থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে (৩৭)

(গ) কোর্সের মেয়াদ বাড়ানো দরকার (২৭)

(ঘ) পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক (৩২)

(ঙ) অতিথি বক্তা নির্বাচনে আরো সচেতন হওয়া উচিৎ (২১)

(চ) মৌখিক উপস্থাপনার বইগুলি সময়োপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় (১৫)

(ছ) শিক্ষা সফরের আওতায় বিভিন্ন এলাকা, প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, সচিবালয় ইত্যাদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (১২)

(জ) ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতি আরও গুরুত্ব দেয়া উচিৎ (১৮)

৪·০· মৌখিক মূল্যায়ন ঃ

কোর্স সমাপনী মূল্যায়ন পাঠ্যক্রমের সামগ্রিক বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করলেও অনেক সময়ে অংশগ্রহণকারীরা লিখিত আকারে সব জাতীয় বক্তব্য পেশ করেন না। মূল্যায়নকে যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ রূপ প্রদানে তাই মৌখিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে বিষয়ভিত্তিক ও কিছু সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের মূল্যায়ন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ–

৪·১· বাংলাদেশ চর্চা ঃ

- শিক্ষানীতি ও পররাষ্ট্রনীতির অধিবেশন হয়নি।
- বাংলাদেশের সম্পদসমূহ মডিউলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেত।
- অনেক হ্যাণ্ড আউটে latest তথ্য ছিল না।
- অতিথি বক্তা নির্বাচনে আরো সচেতনতা প্রয়োজন।
- মিলনায়তনের অধিবেশনসমূহ কার্যকরী হয়নি।

৪·২· খেলাধূলা, শরীর চর্চা ও চিকিৎসা ঃ

- জগিং পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক ছিল না। প্রথমে কম সময় জগিং করিয়ে আস্তে আস্তে সময় বাড়ানো দরকার। কিন্তু এখানে প্রথমেই ১৪/১৫ মিনিট জগিং দিয়ে শুরু করে পরে আর করানোই হয়নি।
- খেলাধূলা প্রতিযোগিতার সময় ঠিক মতো মানা হয়নি।
- মহিলা প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্ধিহান।
- ক্রীড়া কমিটিকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছিল।
- এই কোর্সে অনেক চিকিৎসক প্রশিক্ষণার্থী থাকায় চিকিৎসাকর্মে তেমন অসুবিধা হয়নি।
- ম্যারাথনের সময় মেডিক্যাল টীমকে আরো সক্রিয় হতে হবে।

৪·৩· মৌখিক উপস্থাপনা, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা সফরঃ

- মৌখিক উপস্থাপনার মূল্যায়নের নির্ণায়ক সকল সভাপতির জন্য একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বই নির্বাচনে অধিক সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। একজন ডাক্তারকে আইনের বই, একজন অর্থনীতির ছাত্রকে অর্থনীতির বই দেওয়া ঠিক হবে না।
- আইন সংক্রান্ত ও সংবিধানের বই বাদ দেওয়া উচিৎ।
- ছায়া সভাপতি বার বার একই ব্যক্তির হওয়া ঠিক নয়।
- শিক্ষা সফরে কিছুটা যোগযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়; পূর্ব–জরীপ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংগে আগে থেকে যোগযোগ করা বাঞ্ছনীয়।

- রচনামূলক পরীক্ষা একেবারে বাদ বা আংশিক বাদ দিলে ভাল হয়।
- উত–২ ও উঅ–৩ এর মত প্রশ্নমালা খুবই উপযোগী;
- নিরপেক্ষতার জন্য মূল্যায়ন কোড ব্যবহার করতে হবে।

৪·৪· লোক প্রশাসন ঃ

- আমলাতন্ত্র ও রাজনীতি অধিবেশনটি হয়নি যা খুবই প্রয়োজনীয়;
- সুশীল সেবকের ভূমিকা শীর্ষক অধিবেশন সমূহে বক্তারা বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে নবীন প্রশাসকদের প্রশাসনিক দর্শন অর্জন অসুবিধা হয়েছে;
- সংবিধানের বিষয়ে তেমন আলোচনা হয়নি;
- কর্মী প্রশাসনের অধিবেশনসমূহ বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে;
- বাজেট প্রণয়নের বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।;
- নোট লিখন অধিবেশনে আরো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বক্তা প্রয়োজন;
- কার্যপত্র তৈরী, কার্য বিবরণ লিখন ইত্যাদি বিষয়ে অধিক ব্যবহারিক অধিবেশন প্রয়োজন;
- উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ উপঅবয়বটি লোক প্রশাসনে থাকা বাঞ্ছনীয়।
- প্রশাসনকে নৈতিকতা উপঅবয়বের কিছু বিষয় অন্ততঃ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪·৫· উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ

- হ্যান্ডআউটগুলি অধিবেশনের আগের দিন দিলে ভাল হয়;
- সকল হ্যান্ডআউটই বাংলায় হলে ভাল হয়। সময়ের স্বল্পতার জন্য তা বুঝতে সুবিধা হয়;
- আধিকাংশ হ্যান্ডআউটই বেশ তথ্য বহুল ছিল তবে তথ্য সমূহ হাল নাগাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়;
- সাহিত্য, দর্শন মিশিয়ে অর্থনীতি বোঝানোর কৌশল খুবই সুন্দর;
- বিপিএটিসি অর্থনীতির প্রভাষকদের নিয়ে গর্ব করতে পারেন;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উপ–অবয়বে দল গঠণ কার্যকরী হয়নি, অনেকেই প্রকল্প ছক পূরণ করতে পারবেনা। আরো ছোট দল গঠন করা উচিৎ

৪·৬· ক্যাফেটেরিয়া, ডর্মিটরী ও গ্রন্থাগার ঃ

- ডরমিটরীতে নামাজের স্থান থাকা দরকার;
- ডরমিটরীতে পানি সরবরাহ অনিয়মিত ছিল/মাঝে মাঝে ছিল না।
- রুমবয়দের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। ঘন ঘন বদলীর কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম অনুসরণ করতে পারে নাই;
- কর্তৃপক্ষ কখনোই ডর্মিটরীতে যাননি;
- তোষক, বালিশ রৌদ্রে দেওয়া প্রয়োজন;
- ক্যাফেটেরিয়ার Staff দের মন্তব্য, আচরণ ঠিক নয়;
- PMC কে Staff দের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন;
- বাজারের জন্য সময়মত গাড়ী পাওয়া যায়নি;
- ক্যাফেটরিয়াতে তোয়ালে ও গ্লাসের সংখ্যা অপ্রতুল ছিল;
- লাইব্রেরীতে মউক সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স বই নাই বললেই চলে।

৪·৭· পাঠ্যক্রম প্রশাসনঃ

- পাঠ্যক্রম পরিচালকের সকল স্থানে ছায়ার মত উপস্থিতি অনুপ্রেরণা দায়ক;
- পাঠ্যক্রম প্রশাসনের সার্বিক আন্তরিকতা মনে রাখার মত।

৫·০· বক্তা মূল্যায়নঃ

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমের তুলনামূলক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুষদ বক্তাদের পারদর্শিতার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। একাদশ ও দ্বাদশ পাঠ্যক্রমে অতিথি বক্তাদের পারদর্শিতার গড় মাত্রা অনুষদ বক্তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমে অনুষদ বক্তারা অতিথি বক্তাদের থেকে অধিকতর ভাল পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন (নিম্নের স্বারণী দ্রষ্টব্য)। অনুষদ বক্তা কর্তৃক পরিচালিত অধিবেশন সমূহের মধ্যে ৭০–৭৪ শতাংশ ফলপ্রসূতা অর্জন করেছে এমন অধিবেশনের সংখ্যা ৭টি এবং সংশ্লিষ্ট বক্তার সংখ্যা ৪। তিনজন অনুষদ বক্তা তিনটি পৃথক পৃথক বিষয়ে ৭০ শতাংশের কম ফলপ্রসূতা অর্জন করেছেন। অতিথি বক্তাদের তিনজনের পারদর্শিতার মাত্রা আদৌ আশাপ্রদ নয় (৭০% এর নীচে)।

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অধিবেশন ও বক্তার প্রকৃতিভিত্তিক পরিচালিত তাত্ত্বিক অধিবেশনসমূহের ফলপ্রসূতা

ফলপ্রসূতার মাত্রা	বক্তার প্রকৃতি ও পরিচালিত অধিবেশনের শতাংশ					
	অনুষদ বক্তা			অতিথি বক্তা		
	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ
৯০ ও ৯০ এর উর্ধ্বে (অসাধারণ)	১·৮২	০·২৯	৪·৮১	১১·১১	৬·১৫	২২·৭২
৮০–৮৯ (খুব ভাল)	৪০·৭৩	৩২·০৮	৫৫·৭৭	৩৯·৬৮	৩০·৭৭	৫৪·৫৫
৭০–৭৯ (ভাল)	৪৩·১৬	৫১·১৬	৩৬·৫৪	৪১·২৭	৪৭·৬৯	৯·০৯
৬০–৬৯ (গড়পরতা)	১৩·০৭	১৪·৭৪	২·৮৮	৩·১৭	১০·৭৭	৪·৫৫
৬০ এর নীচে (নিম্নমান)	১·২২	১·৭৩	–৪·৭৭	৪·৬২	৯·০৯	
ফলপ্রসূতার গড় মান (%)	৭৭·৫২	৭৫·৯৮	৮১·১৩	৭৮·৭১	৭৬·৫৮	৭৭·৯৫

৫·১· অতিথি বক্তার উপর নির্ভরশীলতা ঃ

বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক অধিবেশনসমুহ পরিচালনার ক্ষেত্রে অতিথি বক্তার উপর নির্ভরশীলতার হার বেশ কম। তবে ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমে এই নির্ভরশীলতার পরিমাণ পূর্ববর্তী দু'টি পাঠ্যক্রম থেকে কিঞ্চিৎ বেড়ে গেছে। ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমে অতিথি বক্তার উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ ছিল ১৭·৪৬ শতাংশ এবং পরিচালিত তাত্ত্বিক অধিবেশনে অনুষদ ও অতিথি বক্তা কর্তৃক গৃহীত কর্মভারের অনুপাত ছিল ৪·৯৫ঃ১।

পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক অধিবেশন পরিচালনার্থে অনুষদ ও অতিথি বক্তাদের ওপর নির্ভরশীলতার মাত্রা

বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের নাম	গৃহীত কর্মভার (%)		পরিচালিত তাত্ত্বিক অধি–বেশনের ক্ষেত্রে অনুষদ ও অতিথি বক্তা কর্তৃক গৃহীত কর্মভারের অনুপাত
	অনুষদ বক্তা	অতিথি বক্তা	
একাদম	৮৩·৯৩	১৬·০৭	৫·২২ঃ১
দ্বাদশ	৮৪·১৮	১৫·৮২	৫·৩২ঃ১
ত্রয়োদশ	৮২·৫৪	১৭·৪৬	৪·৯৫ঃ১

৫·২· মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশঃ

অনুষদ বক্তাদের মধ্যে যাঁরা ৭০–৭৪ শতাংশ ফলপ্রসূতা অর্জন করেছেন তাঁরা ভবিষ্যতে যাতে আরো ভাল করতে পারেন সে ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ জানানো যায়। যাঁরা ৭০ শতাংশের নীচে পরদর্শিতা দেখিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটাই যদি উক্ত বক্তাদের প্রথম পরিচালিত অধিবেশন হয়ে থাকে তা'হলে ভবিষ্যতে তাঁরা যাতে ভাল করতে পারেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বেশ ক'বার একই অধিবেশন পরিচালনা করার পরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে তবে উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান থেকে তাঁকে বিরত রাখা যায়। অতিথি বক্তাদের মধ্যে যারা ৭০ শতাংশের নিম্ন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদেরকে পরবর্তী পাঠ্যক্রমে আমন্ত্রণ জানানো মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না। অন্য দু'জন অতিথি বক্তার পারদর্শিতার মাত্রা ছিল ৮০% এর নীচে (৭৬%)। এদেরকে পরবর্তী পাঠ্যক্রমে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে অতিথি বক্তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো প্রয়োজন। তাতে সামগ্রিক পাঠ্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

৬·০· পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনঃ

উদ্ভূত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করার ব্যাপারে কেন্দ্র পরিমিত মাত্রায় নমনীয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যক্রম প্রশাসন তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে কার্যক্রমের পরিবর্তন/সংযোজন ঘটিয়ে থাকেন। ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমে ১২টি বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংযোজন ঘটানো হয়। এর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব, টার্ম পেপার, ও মউক প্রতিবেদন সংক্রান্ত পরিবর্তন, শ্রেণীকক্ষ পোশাক–পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

৭·০· অংশগ্রহণকারীদের একক মূল্যায়নঃ

ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমে মোট ২১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনিবার্য কারণ বশতঃ পাঠ্যক্রম চলাকালীন সময়ে একজন অংশগ্রহণকারীকে অব্যহতি প্রদান করা হয়। কোর্স শেষে ২০৮ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সনদ পত্র বিতরণ করা হয় এবং সংগত কারণে বাকী ৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর সামগ্রিক ফলাফল স্থগিত রাখা হয়।

একক মূল্যায়নের ভিত্তিতে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিশেষ বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত গ্রেডের বিস্তরণ

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ও গ্রেড		প্রশিক্ষণের নাম (সংখ্যায়) ও অংশগ্রহণকারীদের বিস্তরণ (%)		
		একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ
৯০ ও তার উর্ধ্বে : (অসাধারণ)	কক গ্রেড	–	–	–
৮০–৮৯ : (খুব ভাল)	ক+ গ্রেড	–	–	৪·৮১
৭০–৭৯ : (ভাল)	ক গ্রেড	১৭·৩৫	৪১·৬৭	৪২·২১
৬০–৬৯ : (গড়পরতা)	খ+ গ্রেড	৭৭·০৪	৪৯·০২	১২·৯৮
৫০–৫৯ : (চলতিমান)	খ গ্রেড	৫·৬১	৯·৩১	–
সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর (%)		৭৫·২৪	৭৯·১২	৮৩·০০

পূর্ববর্তী দু'টি পাঠ্যক্রমের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, এবারকার অংশগ্রহণকারীদের একক মূল্যায়নের ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভাল। অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এবারই প্রথম ক+গ্রেড অর্জন করেছেন। ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমের অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক মূল্যায়নের ফলাফলে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৮৩%। এই নম্বরই এ যাবত বিপিএটিসিতে পরিচালিত সকল বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে উচ্চতম। পাঠ্যক্রমে সর্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬০·৬৫%। সামগ্রিক বিচারে পূর্ববর্তী দু'টি পাঠ্যক্রম থেকে ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রমের অংশগ্রহণকারীদের অর্জিত গ্রেড বিস্তরণও অপেক্ষাকৃত ভাল।

৮·০ উপসংহার:

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রম। অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা–চেতনা ও মানসিক বিকাশে এবং মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়নে এই পাঠ্যক্রমের বলিষ্ঠ ভূমিকা পরীক্ষিত। বাস্তব প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী ঠিক রেখে কার্যক্রমের পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের দরকার হয়ে পড়ে। এছাড়া ইনোভেটিভ চিন্তা–চেতনার বিকাশও এই পাঠ্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। তবে পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন ব্যক্তিক না হয়ে ইনষ্টিটিউশনাল হওযা উচিৎ এবং মূল্যায়ন এই পরিবর্তন, সংশোধনের ভিত্তি হওয়া উচিৎ।

পুস্তক সমালোচনা

দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স

লেখক ঃ উইলিয়াম হান্টার

১·০· ভূমিকা ঃ

উইলিয়াম হান্টার বিরচিত এবং আব্দুল মওদুদ অনুদিত "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স" পুস্তকটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা ১৩৭০ সালে প্রকাশিত। দু'শত ষোল পৃষ্ঠার এই বইখানির প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী; মুদ্রাকর ছিলেন পূর্ববঙ্গ প্রেসের মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। প্রথম সংস্করণে বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। মূল গ্রন্থটি ১৮৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৬ সালে শেষ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে অনুবাদকের প্রচেষ্টায় বইটি "দি কমরেড পাবলিশার্স" কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত হয়।

১·১· পুস্তকটির মূল্য বক্তব্য ঃ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছিল তার কারণ মূলতঃ তৎকালীন মুসলমানদের মূল্যবোধ, ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং তাদের অর্থনৈতিক আচরণের প্রকৃতি অনুধাবনে শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা। জাতি হিসেবে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয়েও নানা দিক বিচারে তারা ছিল

জনাব কাজী হাসান ইমাম দ্বাদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের একজন অংশগ্রহণকারী। উক্ত পাঠ্যক্রমের মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রমের পরিপূরক হিসাবে তিনি এই সমালোচনামূলক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন অনুষদ সদস্য। প্রতিবেদনটিতে বিপিএটিসি প্রদত্ত মউক–অবকাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সাধারণ পাঠক ছাড়াও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

সর্বাধিক অবহেলিত। পাশাপাশি বৃটিশ ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত প্রায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ছিল হিন্দুদের প্রতি প্রসারিত। শাসন ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক নীতির আশু পরিবর্তন ব্যতীত ভারতে বৃটিশ শাসনের সংকটকাল কাটিয়ে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়– এটাই ছিল মূলতঃ বইটির মূল বক্তব্য।

১·২· *গৃহীত অনুকল্পসমূহঃ*

লেখক বইটির কোথাও সরাসরিভাবে কোন অনুকল্পের উল্লেখ করেননি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আর্থিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত অনুকল্পগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ

১· ভারতে বৃটিশ শক্তির সবচেয়ে দূরতিক্রম্য বিপদ হচ্ছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

২· বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষের জন্য শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অদূর দর্শীতাই মুলতঃ দায়ী;

৩· একটি জাতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ ব্যতীত তাদের উপর কোন দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায় না।

পুস্তকটিতে আলোচিত বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক ভারতে বৃটিশ কৃতকর্মের যৌক্তিকতার ভিত্তি নির্মাণে প্রয়াস পেয়েছেন এবং সামগ্রিক আলোচনায় উল্লিখিত অনুকল্পসমূহের প্রমাণ দিয়েছেন।

১·৩· *অনুকল্পের ভিত্তি ও প্রেক্ষাপটঃ*

তৎকালে ভারতে বৃটিশ বুদ্ধিজীবিদের অন্যতম স্যার হান্টার একদিকে শাসক হিসেবে এবং অন্যদিকে একজন বুদ্ধিজীবি হিসেবে দীর্ঘকাল এ দেশের মানুষকে দেখার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুলতঃ তাঁর বুদ্ধিজীবি মনের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই ছিল এই অনুকল্প গ্রহণের ভিত্তি। এছাড়া তৎকালীন নানা বিতর্কের ঝড় ও তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী এগুলো নিরূপণে সহায়তা করেছে।

১·৪· *প্রকাশনাটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিতাঃ*

"দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স" ভারতে বৃটিশ শাসনের ওপর গবেষণালব্ধ একটি ঐতিহাসিক দলিল। মুলতঃ বৃটিশ–ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে লেখা হলেও বিশ্লেষণধর্মী এই গবেষণাটি প্রচ্ছন্নভাবে এদেশের তদানিন্তন কায়েমী শাসক গোষ্ঠীর দুষ্ট চরিত্রের ক্ষতকে উন্মোচিত করে। সৈয়দ আলী আহ্‌সানের মতে " ---- দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে সাধারণভাবে মুসলমানদের ওপর এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের ওপর ইংরেজ

সরকার যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চালান তার আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে ---- এ পুস্তকটিতে। -----" এ সমস্ত দিক বিচারে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অন্ততঃ এদেশবাসীর জন্য অপরিসীম। বন্ধু হড়্সনকে লিখিত উৎসর্গমূলক পত্রে লেখকের নিজের স্বীকারোক্তিতেও বইটির গুরুত্বের কথা সমোচ্চারিত– " ----- সরকারের পর সরকার কর্তৃক ভারত সম্রাজ্যের একটা স্থায়ী বিপদ হিসাবে উল্লিখিত একটি ক্রমাগত সংগ্রামরত জনশ্রেণীর বিগত ইতিহাস ও বর্তমান চাহিদাগুলি আমি এই কয়েক পৃষ্ঠায় পরিস্কারভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি।" অনুবাদকের ভূমিকাতেও বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা প্রতিধ্বনিত হয়– "ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্রন্থখানির মর্যাদা অনেক ----।" আর প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে বলা যায়, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদেশীয় মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকার কথা তো সর্বজন বিদিত এবং এই আন্দোলন যে বৃটিশ শাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারও প্রমাণ মেলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে। বড়লাট লর্ড মেয়ো (জানুয়ারী ১৮৬৯–১৭৭২) ভারতীয় মুসলমানদের এই অব্যাহত অসন্তোষ ও অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন সিভিলিয়ান হান্টারের ওপর। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর স্যার হান্টার যে রিপোর্টটি প্রণয়ন করেন "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স" গ্রন্থটি তারই মুদ্রিত রূপ (অনুবাদকের ভূমিকা ও সৈয়দ আলী আহসানের প্রসঙ্গ কথা থেকে রচয়িত)।

১·৫· *গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ ও তার বৈজ্ঞানিক যথার্থতা*

আলোচ্য পুস্তকটি মূলতঃ একটা এ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ষ্টাডি বা অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ফসল। গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন ভূতপূর্ব ও সমসাময়িক কালের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সিভিলিয়ান হিসাবে তাঁর এদেশের সমাজ জীবন সম্পর্কিত দীর্ঘ দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তার অনুসৃত অনুসন্ধান পদ্ধতিসমূহ যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক।

১·৬· *পদ্ধতি অনুসরণের ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পক্ষপাতিত্ব*

পদ্ধতি অনুসরণে লেখকের বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত পক্ষপাতদুষ্টতা বইটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সমকালীন ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত জ্বলে ওঠা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের দাবানলকে তিনি দেশোদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনই দেশোদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধীদের অন্যতম একজন ছিলেন সৈয়দ আহমদ যাঁর সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। হান্টারের ভাষায় " ---- ১৮৮২ সালে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যু বৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে

বোম্বাই শহের উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতই সাফল্যমণ্ডিত হলো; ---।" অথচ, কুটচক্রের জাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে এদেশের ক্ষমতা দখল 'বৃটিশ পরশক্তিকে বিজয়ের গৌরবে মহিমান্বিত করেছিল' আর এদশেবাসী কর্তৃক বৃটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদ মানেই দেশোদ্রোহিতা ---- এমনই ছিল হান্টারের দৃষ্টিভঙ্গী।

১·৭· *অনুকল্পের সাথে অনুসৃত পদ্ধতির সামঞ্জস্যতাঃ*

স্যার হান্টারের কাজ ছিল একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণে এদেশের মুসলমানদের চরিত্রকে চিত্রায়িত করা। অনুসৃত অনুকল্পের ভিত্তি ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের ঘাঁটি মজবুত করার প্রয়াস। অনুবাদকের মতে " --- পুস্তকখানি লে া হয়েছিল একজন ইংরেজ কর্তৃক শাসক ইংরেজ জাতির কার্যকলাপের সাফাই হিসাবে এবং মুসলিম আযাদী-যোদ্ধাদের কার্যসমূহ বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সে সবের তীব্র নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ---।" সে কারণেই তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা তিনি অনেক ক্ষেত্রে স্বযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি খুঁজে বের করেছেন সে সমস্ত তথ্যাবলী যা-কিছু তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের তিনি সে দৃষ্টিকোণে দেখেছিলেন, যে দৃষ্টিকোণে তিনি তাদের দেখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব থেকেই একটা সংকীর্ণ ফ্রেমে বাধা পড়েছিল।

২·০· *বিষয়বস্তু ঃ*

পুস্তকটিতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত মোজাহেদীন ছাউনী, সিত্তানা ও মুল্‌কার মুজাহিদদের সাথে ইংরেজদের সংগ্রাম-সংঘাত এবং ইংরেজদের বারবার শোচনীয় পরাজয়ের পর শেষে ভেদনীতি ও কুটচালের আশ্রয় নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ধ্বংস সাধন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জিহাদী সংগঠনের বিবরণ; বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকে অজস্র মানুষ ও টাকা পয়সা জিহাদী বসতিতে আমদানী হতো। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে "বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জিহাদ করা জায়েয কিনা" এই তর্কিত প্রশ্নে আলেম সমাজ ও নব্যশিক্ষিত সমাজের সমালোচনা। আর চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের প্রতি যে অবিচারের খড়গ নেমে এসেছিল তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ এবং শাসক মনোভাবমূলক প্রতিকারের উপায়। আমরা যদি বিষয়বস্তুর আরো একটু গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই-

প্রথম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে, বৃটিশ ভারতের সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত জিহাদী আন্দোলনের যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল তা' মূলতঃ ধর্মভিত্তিক "রাজনীতির লাভা'য় উদ্‌গীরিত হয়েছিল। সে সময়ে এই বিদ্রোহে যাঁরা পরাক্রমশালী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন,

তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আহমদের নামটি এই বইটিতে বহুলভাবে আলোচিত। স্যার হান্টার সৈয়দ আহমদকে ভোল পাল্টানো ইসলাম প্রচারক, গোঁড়া, ভণ্ড, মুখোশধারী, উন্মত্ত দস্যু এবং লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হান্টারের ভাষায় সমগ্র বিদ্রোহী মুসলমানরা ছিল মূলতঃ সৈয়দ আহমদের উল্লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং উজ্জীবিত। পাশাপাশি হিন্দু, শিখ ও কিছু কিছু পাঞ্জাবীদেরকে হান্টার প্রভুভক্ত, শিষ্টাচারী ও মঙ্গলদৃষ্ট মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার এদেরই সমগোত্রীয় যারা ইংরেজ শাসনের অবিচারকে সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তাদেরকে হান্টার নিমকহারাম, নরঘাতক বলে অপবাদ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলো এদেশের সূর্য–সন্তান তিতুমীর। হান্টারের ভাষায় তিতুমীর ছিল এক পরাক্রমশালী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লাঠিয়াল এবং সৈয়দ আহমদের যোগ্য শীষ্য। অসংখ্য দুষ্কৃতি ও অপকর্মের এই নায়ককে তোপের মুখে কামান দাগিয়ে সদলবলে নিশ্চহ্ন করা হয়; তার দেহসহ বাঁশের কেল্লাকে করা হয় ছিন্নভিন্ন। এ অধ্যায়ের এক পর্যায়ে স্যার হান্টার সৈয়দ আহমদকে ধর্মপ্রাণ, সৎ, শান্তির বাণীপ্রচারক এক পরম পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকারান্তরে একথাও প্রকাশ করেছেন যে, এত ভালো লোক হয়েও সৈয়দ আহমদের সবচেয়ে ক্ষমার অযোগ্য যে অপরাধটি ছিল সেটা হলো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে পূর্বোল্লেখিত উত্থাপিত প্রশ্নের (ভারতীয় মুসলমানদের মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয কিনা) সমালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওহাবী সম্প্রদায়ের লোককে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গোঁড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ তারা এদেশকে দারুল হরব বা শত্রুর দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হানাফী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় ভারতকে দারুল ইসলাম বা ইসলামের দেশ বলা হলেও এ ব্যাখ্যায় বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত দূরভিসন্ধি কাজ করছে বলে হান্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর ইংরেজ শাসনের অবিচারের কৃতকাহিনী। এখানে হান্টার তাঁর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় মোটামুটি সফলভাবে অবিচারের স্বরূপকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কাযী প্রথার বিলোপ, চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার নিশ্চত করা, মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন, সামাজিকভাবে মুসলমানদের পঙ্গু করে দেয়ার প্রয়াস ইত্যাদি ইংরেজ অবিচারের কাহিনী বিশ্লেষণ করলেও ইংরেজ শাসনের বিবেকহীন পক্ষপাতিত্ব ও নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনীকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

২.১: *বিধৃত অধ্যায়গুলোর পারস্পরিক সামঞ্জস্যতাঃ*

লেখক তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন মুজাহিদদের সাথে ইংরেজদের সংগ্রাম–সংঘাত দিয়ে। ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছেন তাতে ইংরেজদের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, জিহাদ

ও জিহাদী সংগঠনের প্রকৃতি ও পরিসরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং শেষ করেছেন মুসলমানদের ভূতপূর্ব ও সমকালীন সামগ্রিক অবস্থার বিশ্লেষণসহ ইংরেজ সরকারের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রেখে। প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটনাটি বিষয়গুলো উপেক্ষা করলে সামগ্রিক বিচারে পুস্তকটিতে বিধৃত অধ্যায়গুলো পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২·২· *আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তা ও বিধৃত পরিসরঃ*

আলোচ্য পুস্তটির প্রত্যেকটি অধ্যায়কে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীকে হান্টার এত বেশী জোর দিয়েছেন যে, চরম ধৈর্য্যশীল পাঠক ছাড়া অন্যান্যদের খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। অধ্যায়গুলো পারস্পরিক সরল যোগসূত্রের মাধ্যমে সন্নিবেশ করা হয়নি। এ কারণে মূল বক্তব্য অনুসরণে তা' পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে।

২·৩· *আলোচ্য অধ্যায়/অংশসমূহের পরিধি সংক্রান্ত সমালোচনাঃ*

বইটি প্রকাশনার পূর্বে কিছু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল অথবা লেখক নিজেই তথ্যের বিন্যাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারতেন। উদাহরণতঃ প্রতিটি অধ্যায়কে তিনি একটি পারস্পরিক সরল যোগসূত্রের মাধ্যমে সন্নিবদ্ধ করতে পারতেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ঘটনাগুলোকে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ঘটনাগুলোর বর্ণনা আরো একটু সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণধর্মী হতে পারতো। ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য তিনি তৎকালীন বহুল আলোচিত বেশ কিছু কবিতা বা কবিতাংশ তুলে ধরেছেন। এই অংশটিকে তিনি পরিশিষ্টাকারে সংযোজন করতে পারতেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত তদানিন্তন আরবে ধর্মীয় অবস্থার যে ভাঙ্গাগড়া চলছিল সেটাকে তিনি আরো সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারতেন। পুস্তকটির প্রথম দিকেই জাতি হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। তাতে বিভিন্ন অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিশ্লেষণ সহজবোধ্য হতো। গ্রন্থটির সামগ্রিক বর্ণনায় বৃটিশ রাজত্বকালে তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের অবস্থাকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর পূর্বের বা পরের ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা যেমন এক নয়, তেমনি নানা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন অংশের মুসলমানদের ইতিহাসও সকল ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া অবিভক্ত ভারতের একটি জাতির একটি খন্ডিত সময়ের ইতিহাসকে সময়ের ব্যাপক বিস্তৃতিতে খণ্ডিত ভারতের অভিন্ন ফ্রেমে আটকানো অসম্ভব। সে কারণে বইটির নামকরণ ভারতীয় মুসলমান না হয়ে 'বৃটিশ ভারতীয় মুসলমান' হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়।

২·৪· প্রদত্ত যুক্তি, তথ্যসমূহ ও ব্যাখ্যার স্বার্থকতাঃ

আগেই বলা হয়েছে লেখকের যুক্তিগুলো ছিল তথ্যনির্ভর। কিন্তু তথ্য বাছাই ও বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট। লেখক স্বপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে অনেকাংশে ব্যর্থ। চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ নিরঙ্কুশ স্বার্থকতার দাবী রাখে। কিন্তু সরকারকে প্রদত্ত তার কিছু কিছু সুপারিশ শাসক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। উদাহরণতঃ "সরকারেরও কর্তব্য হবে বাঙ্গালী মুসলামানদের মধ্যে (বিরাজমান) অসন্তোষ ---- কঠোরহস্তে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ---" (পৃষ্ঠা–২১০)।

২·৫· অন্যান্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য

পাকভারত উপ–মহাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে সমকালীন বৃটিশ–ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের আলোকপাত খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যই বেশী লক্ষ্যণীয় কারণ সুস্পষ্ট। কনৌজবাসী জনৈক মৌলবীর "তরগিব–উল–জিহাদ", অনুবাদক কর্তৃক বিরচিত "আযাদীর অমর শহীদঃ সৈয়দ আহমদ" এ ধরণের প্রকাশনায় সরাসরি আমরা এ জাতীয় ঘটনার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাই। লেখক সৈয়দ আহমদের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন "আযাদীর অমর শহীদঃ সৈয়দ আহমদ" গ্রন্থে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্টের এক সৈয়দ আমহদকে আমাদের সামনে হাজির করে যেখানে তিনি সৎ, শান্তির বাণীপ্রচারক, দেশপ্রেমিক এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে উদ্ভাসিত (মাহে–নওঃ ১৯৫৭, মে সংখ্যা)। লেখকের তিতুমীর চরিত্র চিত্রণের তুলি মিথ্যার অপপ্রচার বলে প্রতিবাদিত হয় বাংলার ইতিহাসে। দীনবন্ধু মিত্রের আঁকা "নীল দর্পন"–এর করুণ ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত। সতীদাহ প্রথা বিলোপের কৃতিত্ব ছিল রাজা রামমোহন রায়ের। কিন্তু লেখক অবলীলায় এই কৃতিত্ব ইংরেজ শাসকদের বলে মিথ্যা দাবী করেছেন। জাতিভেদ প্রথা উপেক্ষা করার ব্যাপারে লেখক ইংরেজদের যে কৃতিত্বের দাবী করেছেন সেটাও আদৌ সত্য নয়।

৩·০· উপসংহার

"ধনবানের কেড়ে নাও ধন, দরিদ্রের আঘাত হানো মুল্যবোধে" ---- একটি শক্তিশালী জাতিকে পদানত করার ক্ষেত্রে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং নিপূণ হাতিয়ার --- ভারতে বৃটিশ শাসনের এই মৌল নীতিকে লেখক সযত্নে লালন করেছেন কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে

শাসকসুলভ হটকারীতার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক প্রদত্ত পরামর্শ এদেশবাসীর প্রতি বৃটিশ শাসনের "অত্যাচারের খড়গকে" আরো শাণিত করেছিল এবং মুসলমানদের যেসমস্ত ব্যাপারে তিনি সরকারকে সংবেদনশীল হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেগুলো আদৌ গ্রহণ করা হয়নি (পৃষ্ঠা ২০৬-২১০)। বইটির নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে সাধারণভাবে মুসলমানদের উপর, বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ইংরেজ সরকার যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চালিয়েছিল তার আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে এখানে। এদিক থেকে বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.১· *প্রদত্ত মতামত, পরামর্শ ও সমাধানের প্রয়োগযোগ্যতাঃ*

একটি জাতির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিবর্তন ও গতিধারা বিশ্লেষণে ইতিহাসের মূল্য অপরিসীম। এদিক বিচারে এটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। তৎকালীন শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থায় হান্টার প্রদত্ত পরামর্শ ও সমাধান ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য কিন্তু এগুলোর অনেকটির সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

৩.২· *উন্মোচিত নতুন জ্ঞান-চেতনাঃ*

প্রতিটি মানুষের মাঝে একাধিক স্বত্তা বিরাজ করে। স্ব-রূপে স্যার হান্টার ছিলেন একজন ইংরেজ ও শাসক শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে লেখক ও বুদ্ধিজীবি হিসেবে বলীয়ান ছিল তাঁর আরো একটি স্বত্তা। তাই স্ব-রূপের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধী সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের অত্যন্ত গভীরে তিনি যে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তা'হলো, " ---- আমার এ বিশ্বাস সুদৃঢ় যে সৈয়দ আহমদের জীবনে এমন এক সময় এসেছিল যখন তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে বেদনা অনুভব করতেন ---" (পৃষ্ঠা-৪৫)। এদেশবাসীর জন্য এ অন্তরজ্বালা হান্টারের বুদ্ধিজীবি মনেও যে অনুরণিত হয়েছিল তারও প্রমাণ মেলে বন্ধু হড়সনকে লিখিত তাঁরই উৎসর্গপত্রে।

কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশনা তালিকা

প্রকাশনার নাম		প্রতি কপির মূল্য
১।	প্রশাসন সমীক্ষা (ষন্মাসিক বাংলা জার্ণাল)	টাঃ ২০/-
২।	Bangladesh Journal of Public Administration	টাঃ ২০/-
৩।	লোক প্রশাসন সাময়িকী	টাঃ ১৫/-
৪।	Post Entry Training in Bangladesh Civil Service	টাঃ ৪০/-
৫।	Career Planning in Bangladesh	টাঃ ১২০/-
৬।	Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Bangladesh Agricultural University	টাঃ ৪০/-
৭।	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra	টাঃ ৪০/-
৮।	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
৯।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা (ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন)	টাঃ ১২০/-
১০।	Sustainability of Primary Education Projects: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
১১।	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	টাঃ ১০০/-
১২।	(ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১৫০/-
	(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১২৫/-
১৩।	প্রবীণ প্রশাসকের অভিজ্ঞতা	টাঃ ৭০/-
১৪।	Social And Administrative Research in Bangladesh	টাঃ ১৬/-
১৫।	Problems of Municipal Administration	টাঃ ২৮/-
১৬।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants	টাঃ ৫০/-
১৭।	প্রশাসনের মূলনীতি	টাঃ ১৮/-
১৮।	অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ	টাঃ ৬·৫০
১৯।	গণকল্যাণ রাষ্ট্র ও জনশাসন	টাঃ ৬·৫০
২০।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি	টাঃ ৬·৫০
২১।	Famine Manual	টাঃ ৭/-
২২।	The Deputy Commissioner in East Pakistan	টাঃ ১৬/-
২৩।	Social Change and Development Administration in South Asia	টাঃ ৪৫/-
২৪।	Hospital Administration	টাঃ ১৮/-
২৫।	District Administration in Bangladesh	টাঃ ২২/-

অধিক তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা–এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদ্য সমাপ্ত গবেষণা কর্মের তালিকা

1. A Study of Regional Public Administration Training Centres (RPATC) Project, (1988-89).
২. দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মূল্যায়ন (১৯৮৮-৮৯)
৩. দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)
4. On the Job Training Needs Assessment of Class II Level Officers, (1988-89).
৫. বেঞ্চ ক্লার্কদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)
6. Performance Appraisal System for Class III Employees in Bangladesh (1998-89)
7. Evaluation System of Training Programmes for Class III and Class IV Employees : A Study, (1988-89).
৮. তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)
9. Assessment of Training Needs of Class III Employees, (1988-89).
১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮-৮৯)
11. Training Needs Identification for Training of Trainers-TOT, (1988-89).
১২. বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগ নীতি (১৯৮৯-৯০)
১৩. প্রশাসনে মানবিক সম্পর্ক (১৯৮৯-৯০)

লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষে প্রকাশনা কর্মকর্তা মোঃ ইমামুল হক কর্তৃক সাভার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ভূঁইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ১৯২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।